নন্দীগ্রামের মহান কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস, তাৎপর্য ও সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন

নিপীড়িত জনতার বশ্যতাবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের মহান নাম—নন্দীগ্রাম

নন্দীগ্রাম। আজ শোষক ও শাসকের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনতার বশ্যতা-বিরোধী সংগ্রামের জীবন্ত প্রেরণার অন্য নাম। সারা দেশ যখন জনজীবনের উপর একটার পর একটা আক্রমণে বিপর্যস্ত, কলকারখানার শ্রমিক, ক্ষেতখামারের কৃষক, স্কুল-কলেজের ছাত্র, কর্মপ্রার্থী বেকার যুবক ও ঘরে ঘরে সবচেয়ে নিষ্পেষিত নির্যাতিত নারীসমাজ যখন পুঁজিবাদী শোষণে ও ক্ষমতালোলুপ নেতাদের একের পর এক সর্বনাশা পরিকল্পনার সামনে দিশাহারা, যখন ডঃ স্বামীনাথন কমিশনের রিপোর্ট বলছে, সারা দেশে গত দশ বছরে দেড় লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছে, ঠিক সেই সময়ে এক অবিস্মরণীয় বীরত্বপূর্ণ কৃষক-সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হল নন্দীগ্রামের মাটিতে। প্রতিহিংসার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত সশস্ত্র রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে একযোগে দলীয় সশস্ত্র খুনী বাহিনীর অবর্ণনীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে জনসাধারণ শুধু প্রতিরোধ গড়ে তুলল। অকাতরে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে অকথ্য অসহনীয় ও বর্ণনাতীত নিপীড়ন সহ্য করেও বর্বর পেশাদার খুনীবাহিনী সহ রাষ্ট্রশক্তিকে প্রতিহত করল এবং পিছু হঠতে বাধ্য করল। কত নারী গুজরাটের দাঙ্গার চেয়েও বীভৎস যৌন অত্যাচারের শিকার হয়েও চিকিৎসা পেল না, পেল না বিচার—রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাসের পাশব শক্তির কাছে বার বার চূড়ান্ত লাঞ্ছিতা হয়েও মানুষের বিবেকের দরবারে রেখে গেল আকুল আকুতি। কিন্তু শরীরে বিধ্বস্ত হয়েও, স্বজন-হারানো মর্মন্তুদ বেদনা বহন করেও তারা এখনো সংগ্রামের মনোবলে অটুট। সঙ্গত কারণেই এই ঘটনা সারা দেশের প্রগতিশীল সংগ্রামী বিবেকবান মানুষের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই নৃশংস বর্বরতার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে অতি সাধারণ মানুষ থেকে প্রথিতযশা লেখক সাহিত্যিক কবি শিল্পী বিজ্ঞানী বিচারক আইনজীবী ডাক্তার অধ্যাপক সকলেই ধিক্কার জানিয়েছেন একবাক্যে। কবি সাহিত্যিক নাট্যকার শিল্পীরা তাঁদের কবিতায় গল্পে গানে নাটকে নন্দীগ্রামের এই ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং শাসকের স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। অনেকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন সরকারী খেতাব ও পুরস্কার। এঁদের অনেকেই সিপিএম দলের অনুরাগী ছিলেন। তিরিশ বছরের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, জনগণের উপর প্রভুত্বে অভ্যস্ত চরম দাম্ভিক ও অত্যাচারী রাজ্য সরকার দেশব্যাপী মানুষের বিবেকের এই আলোড়নে বিপন্ন ও আতঙ্কিত বোধ করছেন। এবং সত্যকে আশ্রয় করে বিনয়ী নতিস্বীকারের পরিবর্তে আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরছেন শোষকশ্রেণীর পদতলকে এবং পাশবিক দমনশক্তি ও নির্জলা ছলনা, প্রতারণা ও মিথ্যাকে।

এককথায় অপরিমেয় রক্তপাত আর মৃত্যুর বিনিময়ে নন্দীগ্রাম জন্ম দিয়েছে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাময় এক গণসংগ্রামের। নিস্তেজ ও হতাশ জনজীবনের অবরুদ্ধ ব্যথা-যন্ত্রণাকে বশ্যতা-

বিরোধী বিক্ষোভে রূপান্তরের আভাস দেশের মানুষের কাছে উন্মোচিত করে দিয়েছে এই নন্দীগ্রামই। তাই জনগণের এই অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রকাশে শাসকেরা ও শোষক শ্রেণী চরম আতঙ্কিত।

এই সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী অত্যাচারিত মানুষের মানসিকতাকে বুঝতে গেলে এবং ঐতিহাসিক এই সংগ্রামের পাশে আন্তরিক আবেগ নিয়ে দাঁড়াতে গেলে, আমরা মনে করি, এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, প্রস্তুতি এবং পরিণামকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে।

শাসকদলের পরিকল্পনা ও আমাদের প্রচেষ্টা

২০০৪ সালের মার্চ মাসে হলদিয়া ডেভলপমেন্ট অথরিটি (HDA) নন্দীগ্রাম থানার দুটি ব্লকের সমূহ এলাকাকে এবং মহিষাদলকে তাদের আওতাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিপিএম পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতিও এতে সম্মতি দেয়। আমাদের দলের নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটি তখন থেকেই ঐ এলাকায় ব্যাপক জমি অধিগ্রহণের আশঙ্কার কথা প্রচার করতে থাকে। ব্যাপক সাধারণ মানুষ এই আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিতে পারেনি। কিন্তু সিপিএম নেতারা এই আশঙ্কাকে এস ইউ সি'র মিথ্যা প্রচার ও গুজব বলে বোঝাতে চেয়েছে।

এই আশঙ্কার বাস্তব ভিত্তি ছিল আগের ইতিহাস। সিপিএম ফ্রন্ট ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পরেই ১৯৭৯ সালে জমির ফাটকা ব্যবসার ও প্রোমোটারদের লুঠের সুবিধার জন্য একটি আইন তৈরী করে, তার নাম ''ওয়েষ্ট বেঙ্গল টাউন এ্যাণ্ড কান্ট্রি (প্ল্যানিং অ্যাণ্ড ডেভলপমেন্ট) অ্যাক্ট''। এই আইনবলে এ রাজ্যের বড় বড় শহর সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকাগুলিকে যুক্ত করে সরকার মনোনীত ''উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ'' গঠন এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথেচ্ছ পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করে তা নিয়ন্ত্রণ করার ও বহুগুণ দামে তা বিক্রি করার অধিকার দেওয়া হয়। গরীব চাষীদের জমি বিক্রি করতে বাধ্য করার জন্য আগে মকুব করা কর নতুন করে চাপানোর ও ইচ্ছামতো করবৃদ্ধির অধিকারও দেওয়া হয়। বাস্তবে সিপিএম নেতারা তখনই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শোষকদের কাছ থেকে বুঝে গিয়েছিলেন, বড় বড় শহর সংলগ্ন এলাকার আবাসন সহ নির্মাণ কাজে বিপুল পরিমাণ পুঁজি খাটাতে ছুটে আসবে ধনকুবেররা। তার জন্য চাষীকে উৎখাত করে প্রচুর জমি দখল নিতে হবে। তাই আইনটি তৈরী করে পার্টির মধ্যে মুনাফাসন্ধানী নেতাদের কর্তৃত্বে রেখে শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল, হলদিয়া, মেদিনীপুর, খড়্গপুর, কল্যাণী প্রভৃতি শহরগুলিতে মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে তারা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলে। এভাবে গঠিত হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (HDA) হলদিয়ায় হাজার হাজার চাষীর দীর্ঘশ্বাস ও চোখের জল ঝরিয়ে কংগ্রেস সরকার যে জমি অধিগ্রহণ করেছিল তার নিয়ন্ত্রণ নেবার পর সরকারী প্রশাসনকে দিয়ে নতুন করে বিপুল পরিমাণ জমি যখন কেড়ে নেয়, তখন আমাদের দল এককভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তখন পার্টির শক্তি কম থাকায় সম্পূর্ণ প্রতিহত করতে পারা যায়নি। জলের দামে সেই জমির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০০/৩০০/৫০০ গুণ দামে বিক্রি করে বা লিজ দিয়ে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুঠেছে। একটি উদাহরণই যথেষ্ট, সম্প্রতি HDA আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছে, ১০ একর জমি ৯০ বছরের জন্য লিজ দেবে ১০ কোটি টাকায়। অর্থাৎ একর পিছু ১ কোটি টাকা। চাষীর কাছ থেকে একর কিনেছিল ২০/২৫ হাজার টাকায়। অর্থাৎ ৪০০ গুণের বেশী লাভ।

এছাড়া আছে প্রোমোটারদের সঙ্গে কাটমানির ও নির্মাণ শ্রমিকদের মজুরীতে ভাগ বসিয়ে বিপুল টাকার পাহাড়। এই কাজে সারা বাংলায় শাসকদলের নেতারা এত দক্ষ হয়ে উঠেছে যে, আজীবন দুর্নীতিমুক্ত ও দলে অবহেলিত নেতা বিনয় চৌধুরী দুঃখ চাপতে না পেরে প্রকাশ্যে এদের রাজত্বকে 'প্রোমোটারী কন্ট্রাক্টরী রাজ' ও 'চোরেদের রাজত্ব' আখ্যা দিয়ে মন্ত্রীত্ব খোয়ালেন। এটা যে কত সঠিক সেটা সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে হলদিয়ার এক জনসভায় সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠের এক বেফাঁস উক্তিতেও ধরা পড়ে। তিনি 'শিল্পায়ন'-এর মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, এই শিল্পায়নের সুফলেই তিনি অতি দরিদ্র অবস্থা থেকে আজ অনেক সম্পদের মালিক হয়েছেন। এটা খুবই সত্য। হাজার হাজার গরীব চাষী ক্ষেতমজুরকে পথের ভিখারী করে তিনি ও তার মতো নেতারা 'শিল্পায়ন'-এর দৌলতে বহু সম্পত্তি ও টাকার মালিক হয়েছেন। ক্ষমতার দম্ভে ও অর্থলালসায় সিপিএম নেতারা ''হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ'' পরিবর্তন করে ''হলদিয়া তমলুক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ'' গঠন করে পাঁশকুড়া ময়না পর্যন্ত সমগ্র তমলুক মহকুমাকেই আওতাধীন করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই সমস্ত এলাকাতেও আমাদের দল জমি নিয়ে ফাটকা ব্যবসার ও কৃষক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গঠন করে যাচ্ছে।

উপরোক্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই নন্দীগ্রাম ও মহিষাদলের মানুষ ২০০৪ সালে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের আওতায় তাদের এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তকে গভীর শঙ্কার সঙ্গে নেয়। তারপরেই ৪ ও ৬ একর পর্যন্ত যথাক্রমে সেচ ও অসেচ এলাকার জন্য মকুব খাজনা আদায়ের নোটিশ আসতে থাকে চাষীদের নামে। সব দলই তখন নীরব। নন্দীগ্রামে আমাদের দলের জেলা কমিটির ২ সদস্য কমরেড নন্দ পাত্র ও কমরেড ভবানী দাস স্থানীয় কমরেডদের নিয়ে চাষীদের সংগঠিত করে ব্লক অফিসে লাগাতার আন্দোলন শুরু করেন। ২০০৪ সালের মার্চ মাস থেকে একটানা ২ বছর ধরে হলদিয়ার হাজার হাজার কৃষকের ও রাজারহাট নিউ টাউনের ২৬ হাজার কৃষকের করুণ পরিণতির কথা মনে করিয়ে নন্দীগ্রামের মানুষকে বোঝাতে থাকে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা। শত শত সভা ও গ্রাম বৈঠক করে গ্রামে গ্রামে দলের কর্মীরা মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে জনগণকে বোঝায় যে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার চরম অত্যাচারী, ফলে একে রুখতে হলে স্বল্পস্থায়ী নয়, দীর্ঘস্থায়ী লড়াই করতে হবে, নৃশংস অত্যাচার সহ্য করার মনোবল নিয়ে লড়তে হবে। তাই এই লড়াইয়ের হাতিয়ার পাড়ায় পাড়ায় গণকমিটি করতে হবে, যে কমিটি কোন দল বা নেতাকে অন্ধভাবে মেনে নয়, সকলের মত বিচার করে নিজেরা মাথা খাটিয়ে পরিকল্পনা ক'রে কার্যকরী করবে। সাহসী যুবকদের ও মা-বোনদের স্বেচ্ছাসেবক করে প্রস্তুত হতে হবে। এই জনমত গঠনের সংগ্রাম নন্দীগ্রামের মানুষকে মনের দিক থেকে তৈরী করে দেয়।

২০০৫ সালের মাঝামাঝি সংবাদে প্রকাশ পায়, নন্দীগ্রামের জমি ইন্দোনেশিয়ার সালিমদের কেমিক্যাল হাব গড়ার জন্য দেওয়া হবে। সিপিএম কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ বা সেজ) গঠনের লোকদেখানো বিরোধিতা করলেও ২০০৫-এর ১২ সেপ্টেম্বর হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৫ টি থানার ১৩৯ টি মৌজার ৫৮ হাজার একরেরও বেশী জমি এস ই জেড করার জন্য অধিগ্রহণের প্রস্তাব রাজ্য শিল্প দপ্তরের কাছে পাঠায় (Memo No-888/HDA/VII-M-72/05)। এর মধ্যে নন্দীগ্রামের ৩৮ টি মৌজার ১৯ হাজার ১৯৬.১৯ একর

জমি পড়বে। উচ্ছেদ হবে ১৫ হাজার পরিবার, ১২৭ টি প্রাথমিক স্কুল, ৪ টি মাধ্যমিক স্কুল, ৩ টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, ৩ টি মাদ্রাসা, ১১২ টি মন্দির, ৪২ টি মসজিদ, বহু শ্মশান, কবরস্থান, দোকানপাট এবং ঐ পরিবারগুলির সমস্ত ঘরবাড়ি। (তথ্যসূত্র ঃ আজকাল, ১০.১২.২০০৬)

২০০৫ সালের মাঝামাঝি থেকে আমাদের দল সর্বশক্তি নিয়োগ করে আবার নতুন উদ্যমে নন্দীগ্রামের জনগণকে আসন্ন এই বিপদের কথা জানিয়ে সংঘবদ্ধ করতে থাকে। গড়ে তোলে গণকমিটি ''কৃষক উচ্ছেদ বিরোধী ও জনস্বার্থ রক্ষা কমিটি''। গ্রামে গ্রামে তার ১৫ টি শাখাও গড়ে তোলা হয়। এইসব কমিটিতে গ্রামের প্রায় সব মানুষই যুক্ত হন। সিপিএম সিপিআই তৃণমূল সহ অন্যান্য দলের সমর্থকরা তো বটেই, যারা দল করেন না তারাও যুক্ত হন। তখনও পর্যন্ত অন্য কোন দল এই বিপদ নিয়ে জনগণকে জানানোর বা সংগঠিত করার কথা ভাবেইনি। এই এলাকার হাজার হাজার মানুষ নদীতে মাছ ধরেন, মাছ চাষ করেন—তাদের সংঘবদ্ধ করে ঐ কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এক কনভেনশনে রাজ্য মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও কুলতলির এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার মৎস্যজীবীদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলেন। গ্রামভিত্তিক গঠিত গণকমিটিগুলি স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে তুলতে প্রতি সপ্তাহে মশালমিছিল, বা সাইকেল জাঠা, বা বি ডি ও অফিস অভিযান, বা আইন অমান্য চালিয়ে যেতে থাকে।

সিঙ্গুরে কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলন—নন্দীগ্রামের প্রেরণা

সিঙ্গুরে টাটার গাড়ী কারখানার জন্য উর্বর বহুফসলী প্রায় হাজার একর জমি দখলের ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি যেমন সিপিএম নেতারা শোনেনি, যেকোন হীন বর্বর, নৃশংস পদক্ষেপ নিতেও পিছিয়ে যায়নি। একথাও অত্যন্ত সঠিক যে, সিঙ্গুরের চাষীদের বিশেষ করে মহিলাদের প্রতিরোধ সারা বাংলার কৃষক তথা শ্রমজীবী জনগণকে চিনিয়ে দিয়েছে, এই সরকারী নেতাদের দ্বিচারিতা ও জনগণের সংগ্রামী মেজাজের দৃঢ়প্রত্যয়। যাঁরা এতদিন ভাবতেন, চাষীরা ভীরুতা-জড়তায় আচ্ছন্ন, ঘোমটা ঢাকা মা-বোনেরা শুধু কাঁদতে জানে, ঘরকুনো, আড়ষ্ট—সিঙ্গুরের মহান সংগ্রাম বহু প্রচলিত এই ধারণাকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মিথ্যা প্রমাণ করে চাষীদের ও মহিলাদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ, সাহস, তেজ ও সংগ্রামী মনোবলের অনির্বাণ অগ্নিশিখা মানুষের চোখে এক নতুন সত্যকে তুলে ধরেছে, নন্দীগ্রামকেও উদ্বুদ্ধ করেছে। পুলিশের বর্বর অত্যাচারে রাজকুমার ভুলের মৃত্যু ও সিপিএম নিয়োজিত টাটার পাহারাদার দলীয় গুণ্ডাদের দ্বারা ধর্ষিতা ও জীবন্ত দগ্ধ কিশোরী তাপসী মালিকের মৃত্যু সত্ত্বেও সিঙ্গুরের মানুষ এখনো সংগ্রামী অটুট মনোবল নিয়েই প্রস্তুত। এই মনোবল সারা বাংলাকে ফিরিয়ে দিয়েছে প্রতিরোধের প্রত্যয়। এই প্রত্যয় খুঁজেছে সঠিক নেতৃত্বের পথনির্দেশ, বারবার মার খেয়েও ফুঁসে উঠেছে। কিন্তু দোদুল্যমান দুর্বল তৃণমূল নেতৃত্বের সুসংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী ও আপোষহীন সংগ্রামে আপত্তি এবং নির্বাচনমুখী চমকপ্রদ কিছু অবিবেচক পদক্ষেপের ফলে সিঙ্গুরের আন্দোলন সঠিক পরিণতিতে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে।

আমাদের দল সার্বিক সামাজিক অন্যায় ও শোষণের আমূল উচ্ছেদ চায় ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদ-বিরোধী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিপর্বে তার পরিপূরক গণআন্দোলন গড়ে তোলে। জনগণকে গণসংগ্রাম কমিটিতে এনে সক্রিয় করে নিজস্ব চিন্তাশক্তি

গড়ে তোলার, বিচার করার, রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার এবং সঠিক বিপ্লবী আদর্শ ও নেতৃত্বকে চিনে নেবার ক্ষমতা অর্জন করার শিক্ষায়তন হিসেবেই গণআন্দোলনকে দেখে ও চালায়। এবং এ পথেই রাষ্ট্রশক্তিকে চেনায় ও আশু দাবী আদায়ে আপোষহীনভাবে জনগণকে সংগ্রামে পরিচালনা করে। কিন্তু অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভুত জনগণের সমস্যাগুলি নিয়ে অন্য পরিষদীয় দলগুলি সংগ্রামে সামিল হয় সম্পূর্ণ নির্বাচনসর্বস্ব লাভের দিক বিবেচনা করে। তারা ঐ সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে এবং পুঁজিপতিদের লুণ্ঠন লালসাকে আড়াল করে। শাসক সরকারের ও ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে প্রচার ও মিডিয়ানির্ভর নেতৃত্বের প্রভাব বাড়াতে চায়। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে নেতৃত্বের প্রতি নির্ভরশীলতায় বেঁধে রাখতে চায়। তাই দেখা যায়, এ রাজ্যে যে সমস্ত দল বাসভাড়া বা কৃষক উচ্ছেদ নিয়ে আন্দোলনের মহড়া করে প্রচারের আলোয় আসতে বা বিরোধী ইমেজ তুলে ধরতে খুবই ব্যস্ত, সেই দলগুলিই অন্য রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে বাসের ভাড়া বাড়াচ্ছে বা কৃষক উচ্ছেদ করছে। দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যটি মিডিয়ার প্রভাবে জনগণের, এমনকি বহু চিন্তাশীল মানুষেরও চোখের আড়ালে থেকে যায়।

সিঙ্গুরে টাটার জন্য কৃষিজমি নেওয়া হবে, একথা প্রকাশ হওয়া মাত্রই আমাদের কর্মীরা দলগতভাবে বিক্ষোভ জানানোর সাথে সাথে দলমত বিচার না করে কৃষকদের সমবেত করে কৃষিজমি রক্ষা কমিটি গড়ে তোলে, যার অন্যতম সম্পাদক হন আমাদের দলের স্থানীয় সংগঠক কমরেড শঙ্কর জানা। কিন্তু এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাব ও সংগঠন অনেক বেশী থাকায় তারা কমিটিতে থেকেও কমিটির নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্ত্বা বজায় রাখতে না দিয়ে প্রতি পদে দলীয় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে বাস্তবে কমিটিকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে চান। অন্যদিকে আমাদের দল পাড়া ধরে মহিলা ও যুবকদের নিয়ে কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করতে থাকে, যাঁরাই প্রকৃতপক্ষে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু নির্বাচনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থাকায় যখন সিঙ্গুরের জনগণ নিজেদের জমি দখলে রাখার জন্য মার খেয়েও পুলিশবাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়ে যাচ্ছে, তখন তৃণমূল নেতৃত্ব সেই লড়াইকে থামিয়ে কলকাতায় প্রচারসর্বস্ব অনশনমঞ্চে নিয়ে গেলেন।

তাছাড়া এদেশীয় একচেটিয়া শোষক টাটা বিড়লা আম্বানিরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগসাজসে চাষী মজুরদের নিকৃষ্টতম শোষণের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সেজ) গঠনের পরিকল্পনা করে। এর প্রথম রূপদান ২০০১ সালে করে তৃণমূল-বিজেপির এন ডি এ জোট এবং ২০০৪ সালে সেই নকশাকে বাস্তবায়িত করে সিপিএম-কংগ্রেসের ইউ পি এ জোট। এই নকশা অনুযায়ী সিঙ্গুর আন্দোলন চলাকালেই উড়িষ্যার কলিঙ্গনগরে আদিবাসীদের জমি কেড়ে টাটাকে দিতে গিয়ে ১২ জন আদিবাসীকে গুলি করে হত্যা করে এন ডি এ জোটের বিজেপি-বিজেডি সরকার। তৃণমূল কংগ্রেস এ বিষয়ে নীরব থাকে। এমনকি সিঙ্গুরে আন্দোলনে অংশ নেবার শুরুতেই টাটাদের সঙ্গে তৃণমূল নেত্রী দেখা করেন এবং তাদের আশ্বস্ত করেন, যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ফলে তৃণমূল নেতৃত্বের দোদুল্যমান আপোষমুখিতা থাকতে বাধ্য। এই কারণে আশু দাবী আদায়ের দৃঢ়তাও তাদের থাকতে পারে না। আন্দোলনকে নির্বাচনের

সীমার মধ্যেই বেঁধে রাখার প্রয়োজনে বিকল্প বিরোধী দলকে মদত দেওয়া পুঁজিপতিদেরই পরিকল্পনা। নাহলে শাসনক্ষমতায় যাদের রেখে তারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা করছে তারা জনপ্রিয়তা হারালে কার উপর তারা নির্ভর করবে? তাই সিঙ্গুরে কৃষকদের ও মহিলাদের অভূতপূর্ব বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সত্ত্বেও নন্দীগ্রামের স্তরে তা যেতে পারল না।

আমরা যথার্থই মনে করি, সর্বত্র নীচুস্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে বহু কর্মী সমর্থক আছেন, যাঁরা সাহসী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাব রাখেন। যেমন সিপিএম দলেরও বহু সমর্থক কর্মী আজ তাদের নেতাদের মজুর চাষী নিধনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্যক্ত করছেন। এদের সকলের যোগদানেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন বেগবতী হয়েছে। সিঙ্গুরের কৃষিজমি অধিগ্রহণ বিরোধী এই সংগ্রাম সারা বাংলাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে। অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত নন্দীগ্রামের মানুষ সিঙ্গুর আন্দোলনের সংগ্রামী প্রেরণা ও ব্যর্থতার থেকে শিক্ষা নিয়ে মেরুদণ্ড শক্ত করে তৈরী থেকেছে।

আমাদের দল আগাম বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে ২০০৪ সাল থেকে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিলেও আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় যখন নন্দীগ্রামের মানুষ উৎকণ্ঠিত, তখন ২০০৬ এর শেষার্ধে তৃণমূল কংগ্রেস একটি 'কৃষি জমি রক্ষা কমিটি' গঠন করে এবং তারপরে জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ এলাকার ও বাইরের কিছু মানুষকে নিয়ে গঠন করে 'গণউন্নয়ন ও জন অধিকার মঞ্চ'।

সিপিএম প্রকাশ্যে এল ঃ ঝুলি থেকে শেয়াল বেরোল

২৯ ডিসেম্বর নন্দীগ্রামে সিপিএম একটি জনসভা ডাকে। অন্যান্য থানা থেকে প্রচুর লোকজন এনে সাংসদ তথা এইচ ডি এ চেয়ারম্যান লক্ষ্মণ শেঠ সেখানে ঘোষণা করেন, আপাতত নন্দীগ্রামের ২৭ টি মৌজার ১৪ হাজার ৫০০ একর জমি অধিগ্রহণ হবে, এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে কেমিক্যাল হাব হবে। প্রত্যেক পঞ্চায়েত অফিসে ৩ জানুয়ারী নোটিশ যাবে। নন্দীগ্রামের সিপিএম সমর্থক গরীব চাষী ক্ষেতমজুর মৎস্যজীবী সহ বেশ কিছু মানুষ এতদিন আমাদের দলের প্রচার সত্ত্বেও ভাবতো সিপিএম গরীবের দল, এতবড় আঘাত হানবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু ঐ সভার পরেই সর্বত্র অভূতপূর্ব এক অভ্যুত্থানের মতো, বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো মানুষের বিদ্রোহী অভিব্যক্তি বেরিয়ে আসে। নোটিশ জারি হয়েছে শুনে ঘরবাড়ি সহ সর্বস্ব হারানোর আশঙ্কায় ৩ জানুয়ারী কালিচরণপুর অঞ্চল অফিসের দিকে হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড়ো হতে থাকে। সিপিএম নেতারা ও এলাকার ত্রাস হিসেবে পরিচিত কয়েকজন ক্রিমিনাল পুলিশের দমনপীড়নের আশ্রয় নেয়। বিক্ষোভ শেষে ফিরে যাওয়া মানুষের উপর অঞ্চল অফিস থেকে ১ কিলোমিটার দূরে বিনা প্ররোচনায় পুলিশ লাঠি ও গুলি চালায়। রুখে দাঁড়ায় মানুষ। বুলেট ও লাঠিতে শতাধিক আহত হয়। পার্টির নন্দীগ্রাম লোকাল সম্পাদক কমরেড নন্দ পাত্র দ্রুত ঘটনাস্থলে যান এবং রুষ্ট ক্ষুব্ধ বিশাল জনতার রোষবহ্নিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি ঐ সময়ে না নিয়ন্ত্রণ করলে ক্ষিপ্ত জনতার ঐ বিস্ফোরণ অন্য আকার নিতে পারতো। জনরোষ দেখে পুলিশ পালায়, তাদের ১ টি জীপ ধাক্কা খায় বিদ্যুতের খুঁটিতে, তার ছিঁড়ে আগুন ধরে যায়। নন্দীগ্রামের মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনের ও তেভাগা আন্দোলনের এবং ১৯৮২ সালের নন্দীগ্রাম উন্নয়ন পরিষদ-এর আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় জানে, এরপরে বিশাল পুলিশবাহিনী ঢুকে নৃশংস অত্যাচারে গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য করে এলাকা দখল করে

নেবে। তাই সেইসব দিনের মতোই তারা রাস্তা কেটে নিজেদের চরম অসুবিধা সত্ত্বেও আন্দোলনের স্বার্থে রাতের পর রাত জেগে পাহারা দেয়। মানুষ সিপিএম নেতাদের জিজ্ঞাসা করে, কেন তারা এতদিন এই অভিসন্ধি গোপন রেখেছিল। কিন্তু স্থানীয় নেতারা পালায় লক্ষ্মণ শেঠ, অশোক গুড়িয়া, নির্মল জানা সহ দলের ঊর্দ্ধতন নেতাদের কাছে। এই অবস্থায় সর্বস্ব হারানোর বিপদের সামনে নন্দীগ্রামের ব্যাপকতম মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহকে লক্ষ্য করে আমাদের দল তৃণমূল ও জমিয়তের কাছে প্রস্তাব রাখে যে, আলাদা না রেখে এখন সমস্ত কমিটির ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এই প্রস্তাবে সকলে সায় দেন। তখন পূর্বগঠিত সমস্ত কমিটিগুলির কর্মকর্তারা একত্রিত হয়ে ৫ জানুয়ারী এক সভায় মিলিত হন। সেই সভায় আমাদের দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা, জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ-এর রাজ্য সম্পাদক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, জন ও গণ অধিকার মঞ্চের প্রণব ব্যানার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহায়তায় ৫-৬ জানুয়ারী বিস্তারিত আলোচনা শেষে গঠিত হয় ''ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'' নামে আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ। সিপিএমের সমস্ত সমর্থক সহ সব দলমতের মানুষই তাতে সামিল হয়। ৬ই জানুয়ারী বিকালে গড়চক্রবেড়্যা ভূতার মোড় সংলগ্ন মাঠে ৪০ হাজার মানুষের বিশাল জনসভায় কমিটির উদ্দেশ্য ও আন্দোলনের সামনে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে উপরোক্ত নেতারা সহ আমাদের দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, অ্যাডভোকেট সেখ সফিউদ্দিন আহমেদ, কাঁথির বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য রাখেন। এই আন্দোলনের শক্তি ও সম্ভাবনা, জনগণের ভূমিকা ও কি কি বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার, তা ব্যাখ্য করেন কমরেড সৌমেন বসু।

সিপিএম নেতারা বুঝতে পারেন, নন্দীগ্রামে সহজে জমি কেড়ে নেওয়া যাবে না। এই আন্দোলনে দুই সম্প্রদায়ের মানুষকেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে সরকারী নেতারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধকে ভাঙার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু সাম্প্রদায়িক রঙ চড়ানোর চেষ্টা করেন। আমাদের কর্মীরা সর্বশক্তিতে এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে পার্টির শিক্ষা অনুযায়ী ব্যাপক প্রচার চালায়। শাসক নেতাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সাম্প্রদায়িক ভেদসৃষ্টির হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে বুদ্ধবাবু বললেন, হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নোটিশ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। বললেন, ওসব ছিঁড়ে ফেলুন। অথচ হাইকোর্টে ৩ মাস বাদে ১৩ এপ্রিল সরকারী হলফনামায় লেখা হল, সরকারের পরামর্শেই ঐ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই হল সিপিএম নেতাদের সত্যি কথার স্বরূপ। নন্দীগ্রামের মানুষ এই বিশ্বাঘাতকতাকে ক্ষমা করেনি।

সাম্প্রদায়িকতার প্রচারে সুবিধা হলো না বুঝে টিভিতে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ নেতা বিনয় কোঙার উত্তেজক উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেন। বলেন, ''আন্দোলন না থামালে চারদিক থেকে ঘিরে ওদের জীবনকে নরক বানিয়ে দেব (লাইফ হেল করে দেব)''। আর সেই সঙ্গে বিমান বোসের হুমকি ও মিথ্যাচার, আর চতুর অভিনয়পটু বুদ্ধবাবুর নীরব সম্মতিতে ও অধিগ্রহণের প্রতারণামূলক বিবৃতিতে মদতপুষ্ট হয়ে লক্ষ্মণ শেঠ ও কেশপুরের সুশান্ত ঘোষ সুদূর ভাঙড়, ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ, মেটিয়াবুরুজ, যাদবপুর, হাওড়া ও হুগলী থেকে এবং মেদিনীপুরের বিভিন্ন থানা থেকে লঞ্চে, ট্রেকারে, গাড়ীতে দেড় হাজার বন্দুকধারী বোমাবাজ

দক্ষ ঘাতকবাহিনী এনে খেজুরীতে ৫ টি ক্যাম্প করে জড়ো করে। 'দৈনিক স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ও 'বর্তমান' পত্রিকায় লেখা হয়েছে, এ কে-৪৭ এর মতো ভয়ঙ্কর অস্ত্র, রাইফেল, হাতকামান সহ এই বাহিনীকে লক্ষ্মণ শেঠ নিজে পরিচালনা করেছেন ও লক্ষ্মণবাবু প্রতি ৫ জনের গ্রুপকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন হামলা, খুন ও লাশ গায়েব করার জন্য। লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতিদিন খরচ করে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বোমা সহ সহস্রাধিক ক্রিমিনালকে জড়ো করার সংবাদ সমস্ত সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও সিপিএম নেতারা সদুত্তর দিতে পারেন নি।

৭ জানুয়ারী বুদ্ধবাবু-লক্ষ্মণবাবুদের কৃষক নিধন যজ্ঞ

৬ জানুয়ারী সন্ধ্যা থেকে সারারাত বোমাবর্ষণ করা হয়। নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড ভবানী দাস ও কমরেড নন্দ পাত্র আমাদের দলের বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের মাধ্যমে জেলা ও রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ অফিসার, এমনকি রাজ্যের মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিবকে ও ডি জিকে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবী জানিয়ে বারবার ফোন করেন। কাঁথির বিধায়ক শ্রী শুভেন্দু অধিকারীও ফোনে সর্বত্র জানান। কিন্তু খেজুরীতে সিপিএমের শিবিরগুলিতে পুলিশ পাঠিয়ে তাদের নেতাদের বা খুনীবাহিনীকে থামানো হল না। ৭ জানুয়ারী ভোর রাতে ঘাতকবাহিনীর ভয়াবহ গুলি ও বোমা বর্ষণে শতাধিক মানুষ আহত হলো, শহীদ হলেন ৩ জন, তার মধ্যে আছে ভরত মণ্ডল ও ১১ বছরের ছাত্র বিশ্বজিত মাইতি । শহীদ সেলিমের ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দেহ হত্যাকারীরা খালের পাঁকে পুঁতে দিয়েছিল। কৃষকের রক্তে হাত রাঙিয়ে নন্দীগ্রামের মাটি ভিজিয়ে গণহত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে নেতারা ভেবেছিলেন, সবাই পালিয়ে যাবে, তারপর জনশূন্য গ্রামগুলি তুলে দেওয়া যাবে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের হাতে। কিন্তু তা হলো না। স্বজন-হারানো শোকার্ত নন্দীগ্রাম আরো দৃঢ়, আরো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ালো।

তিরিশ বছর একটানা শাসনক্ষমতায় থাকার ফলে সিপিএম নেতাদের সীমাহীন স্পর্দ্ধা ও ঔদ্ধত্য অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছিল, আর কথায় কথায় জানাচ্ছিল, 'আমরা ২৩৫ জিতেছি, পরোয়া করিনা।' —যেন এই বাদশা সম্রাটদের মর্জির পায়ে জনগণকে কীট পতঙ্গের মতো অনুগ্রহ নিয়ে থাকতে হবে, যেন জনগণের ও দেশের যে কোন প্রশ্নেই যা ইচ্ছা করার লাইসেন্স তারা পেয়ে গেছেন। নন্দীগ্রামের সংগ্রামী কৃষক জনগণ সেই ঔদ্ধত্যের গালে সজোরে থাপ্পড় মেরে কিছু সময়ের জন্য হলেও তাদের দাঁড় করিয়ে দিল।

৭ জানুয়ারী সিপিএম সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আমাদের দল ৮ জানুয়ারী বাংলা বন্‌ধের ডাক দেয়। পৃথকভাবে নকশালপন্থীরা এবং তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেসও বন্‌ধ ডাকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্‌ধ সফল করার মধ্য দিয়ে রাজ্যের মানুষ এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ৮ জানুয়ারী তমলুক জেলাশাসক সর্বদলীয় সভা ডাকেন। সেই সভায় আমাদের দলের জেলা সম্পাদক মানব বেরা ৩ জানুয়ারী পুলিশের গুলিচালনা ও ৭ জানুয়ারীর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবী করেন। দাবী করেন, খেজুরীর দিক থেকে সিপিএম সশস্ত্র বাহিনীর বোমা-গুলি চালানো বন্ধ করতে হবে। নন্দীগ্রাম চণ্ডীপুর রাস্তায় বাস ও ট্রেকার থেকে নামিয়ে যাত্রীদের হয়রানি, হলদিয়াতে খেয়াঘাটে নন্দীগ্রামবাসীর উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হয়, পুলিশ ক্যাম্প করে বোমা ও গুলিবর্ষণ বন্ধ করা হবে। রাজনৈতিক দলের কোন ক্যাম্প নন্দীগ্রামের সীমানার ৫ কিমির মধ্যে থাকবে

না। ভিতরের কাটা রাস্তাগুলো গ্রামবাসীরাই মেরামত করে দেবে, তারা না করতে পারলে সরকার সংস্কার করে দেবে। কিন্তু সর্বদলীয় সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে শাসক দল বোমা বর্ষণ ও আন্দোলনের সমর্থকদের লাঞ্ছনা এবং নন্দীগ্রামকে চারদিক থেকে অবরোধ চালিয়ে যেতে থাকলো। আর সিদ্ধান্ত কার্যকর না করার ফালতু অভিযোগ তুলে প্রশাসন আন্দোলনকারীদের উপর দোষারোপ করতে লাগল।

নন্দীগ্রামে ৭ জানুয়ারী সিপিএমের সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণে সংঘটিত হত্যালীলার পর এলাকায় আন্দোলনরত নন্দীগ্রামবাসীর কাছে ১০ জানুয়ারী পৌঁছান আমাদের দলের পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ছাড়াও ছিলেন শিক্ষক আন্দোলনের নেতা দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী, দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা এবং মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড লেখা রায়। তাঁরা নন্দীগ্রামবাসীর সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানান এবং নিহত ও আহতদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান। ১২ জানুয়ারী নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী মেধা পাটকর নন্দীগ্রামে আসেন, নন্দীগ্রামের হাজরাকাটাতে নন্দীগ্রামবাসীর বাস্তু ও কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনের সমর্থনে এক বিশাল সভায় বক্তব্য রাখেন। এই সভায় অন্যান্যদের সাথে বক্তব্য রাখেন আমাদের দলের মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান।

১৯ ফেব্রুয়ারী তমলুকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক অফিসে দ্বিতীয়বার সর্বদলীয় বৈঠক বসে। সভায় আমাদের দলের জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা পূর্বের সর্বদলীয় সভার সিদ্ধান্ত (৮ জানুয়ারী) কার্যকর না হওয়ার জন্য প্রশাসনকে দায়ী করে বলেন, প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা নিলে খেজুরীর দিক থেকে শাসক সিপিএম দলের সশস্ত্র বাহিনী প্রতিনিয়ত বোমা-গুলি বর্ষণ করতে পারত না। সিপিএমের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়, নন্দীগ্রামে জমি নেওয়া হবে না—একথা মুখ্যমন্ত্রী বার বার ঘোষণা করা সত্ত্বেও কেন আন্দোলন চালানো হচ্ছে? আমাদের দলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়, মৌখিক কথার মূল্য কি? সিপিএম নেতারা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যটি লিখে দিন, সেটাই সরকারীভাবে জেলাশাসকের পক্ষ থেকে হ্যাণ্ডবিল করে নন্দীগ্রামে বণ্টন করা হোক। সিপিএম নেতারা সরকারী হ্যাণ্ডবিল করতে রাজী হননি। পূর্বের সভার সিদ্ধান্তগুলি পুনরাবৃত্তি করেই সভা শেষ হয়। ২২ ফেব্রুয়ারী নন্দীগ্রামে বি ডি ও অফিসে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সভা কার্যত বানচাল হয়ে যায়। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেন, সিপিএমের সশস্ত্র বাহিনীর খেজুরীর দিক থেকে আক্রমণ, নন্দীগ্রাম-চণ্ডীপুর রাস্তায় যাত্রী হয়রানি, হলদিয়ায় নন্দীগ্রামবাসীদের লাঞ্ছনা বন্ধ না হলে সর্বদলীয় বৈঠক অর্থহীন।

১০ মার্চ আবার সর্বদলীয় সভা ডাকা হয়। পূর্বের দুটি সর্বদলীয় সভার কোন সিদ্ধান্তই কার্যকর না হওয়ার কারণে আমাদের দল সহ আন্দোলনের সমর্থক দলগুলি জেলাশাসককে ফোনে জানিয়ে সভা বয়কট করে।

'ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানো'র দাবীর পেছনে আসল উদ্দেশ্য

৩ জানুয়ারী পুলিশের গুলিচালনার পরে বুদ্ধবাবু বলেছিলেন, জমি নেওয়ার বিষয়টা গুজব,

তিনি এইচ ডি এ'র নোটিশ নিয়েও কিছু জানেন না। তাহলে ৭ জানুয়ারী এভাবে পেশাদার খুনীদের পাঠিয়ে খুন করা হল কেন? আবার ৭ জানুয়ারীর ৩ দিন পরে বুদ্ধবাবু বললেন, ভুল হয়েছে, জোর করে নন্দীগ্রামে জমি নেওয়া হবে না। আমাদের দল তখনই বলেছিল, এটা প্রতারণা। সত্যিকার ভুল স্বীকার করলে তিনি সমস্ত খুনীদের ও প্ররোচনাকারীদের শাস্তি দিতেন, খেজুরীতে শিবিরগুলিতে 'ঘরছাড়া' নাম দিয়ে বিভিন্ন থানা ও জেলা থেকে জড়ো করা ব্যাপক পেশাদার সশস্ত্র খুনী সমাবেশ বন্ধ করতেন। আর হলদিয়ায়, চণ্ডীপুরে নন্দীগ্রামবাসীকে বাস থেকে নামিয়ে মারধোর ও হেনস্থা বন্ধ করতেন, মানুষ আস্থা ফিরে পেত। মানুষই বুঝতো প্রশাসন ও পুলিশ দলীয় বেতনে চলে না, জনগণের টাকায় চলে, সত্যিকার নিরপেক্ষ। অপরাধীদের তারা শাস্তি দেয়। এটার প্রমাণ পেলে নন্দীগ্রামের মানুষই কেটে দেওয়া রাস্তা সারিয়ে দিত। কিন্তু তা না করে একদিকে ভুল স্বীকারের ছলনা, অন্যদিকে খেজুরী সীমানা থেকে প্রতি রাতে নন্দীগ্রামের দিকে লক্ষ্য করে ভয়াবহ বোমা ও গুলিবর্ষণ, রাস্তাঘাটে হেনস্থা ও মারধোর, হলদিয়ায় কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের মারধোর ও জরিমানা চলতেই থাকলো। আর চলতে থাকলো পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বদলীয় সভার নামে রাস্তা সারাতে হবে, পুলিশকে ঢুকতে দিতে হবে—এই চাপ সৃষ্টি। বাস্তবে নন্দীগ্রামে সিপিএমের হাতেগোণা নগণ্যসংখ্যক ক্রিমিনাল ছাড়া সমস্ত সমর্থকই বাড়ি জমি রক্ষার আন্দোলনে সামিল। নগণ্যসংখ্যক নেতা ক্রিমিনাল ও পুলিশ দিয়ে গুলি চালিয়ে মানুষের মনোবল ভাঙতে না পেরে ৩ জানুয়ারী খেজুরী সীমান্তে দলীয় ক্যাম্পে জড়ো করা বাইরের খুনী ঘাতক বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ৭ জানুয়ারী সিপিএম গণহত্যা চালায়। এদেরই 'ঘরছাড়া' নাম দিয়ে নেতারা রাজ্যবাসীকে ঠকাতে কখনো দুশো, কখনো তিনশো, আবার কখনো তিন হাজারও বলেছে। প্রচারে গুরুত্ব পাচ্ছে না দেখে তাদের পরিবারের লোকদেরও তারা পরবর্তীকালে নিয়ে যায়। এই ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানোর কথা বলে বাস্তবে সিপিএম নেতারা অধিগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সাড়ে ৪ টি অঞ্চলকে পদানত করার ফন্দি আঁটতে থাকে। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হোক, খেজুরী থেকে বোমা গুলি বন্ধ হোক, আর অপরাধীদের পরিবারের আদৌ যদি কেউ বাইরে থাকেন—সসম্মানে বাড়ি ফিরুক, কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। ফলে মানুষ তিক্ত অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, নেতাদের ঘৃণ্য কৌশল হলো একবার পুলিশ ঢুকলে তার সাথে ৫/৬ টি জেলা থেকে আনা পেশাদার হাজার দেড়েক খুনী ক্রিমিনাল ঢুকে খুন ধর্ষণ লুঠ করে সন্ত্রাসের পরিমণ্ডল বানিয়ে খেজুরী-গড়বেতা-কেশপুরের মতো সিপিএম মার্কা 'আদর্শ গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করে কৃষকদের দিয়েই 'আমরা জমি দিতে চাই' বলানো হবে। নন্দীগ্রামের মানুষ এটা ধরে ফেলেছে। এই ধরে ফেলাটাই তাদের অপরাধ। তাই বুদ্ধবাবুরা ১৪ মার্চ মুখোশ খুলে নিজেদের রক্তলোলুপ স্বরূপ মেলে ধরলেন।

বিভীষিকাময় ১৪ মার্চ

১৪ মার্চ নন্দীগ্রামের মানুষের কাছে বিভীষিকাময় আতঙ্কের দিন, রাজ্যের তথা দেশের গণতন্ত্রপ্রেমী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছেও। ঐ দিন বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কুৎসিত ঘৃণ্যতম নজির স্থাপিত হলো স্বাধীনতার ৬০ বছরের ইতিহাসে। গণহত্যা, গণধর্ষণ, শিশু-নারী-বৃদ্ধদের উপর বর্বর নিষ্ঠুর নির্যাতন ও লাঞ্ছনার এমন কদর্য ঘটনা জালিয়ানওয়ালাবাগেও ঘটেনি।

একথা কি কোথাও শোনা গেছে, সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে পুলিশের পোষাকে শাসক দলের প্রাইভেট খুনীবাহিনী একত্রে হত্যাকাণ্ড চালায়? গুলিবিদ্ধ আহতদের পিটতে পিটতে খুন করে লাশ পাচার করে? এটা গণতন্ত্র? না, ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস? এমনকি রাজ্যপাল প্রশ্ন তুলেছেন, এ তো কোনও সন্ত্রাসবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই নয়, বিদেশী দখল মুক্ত করার যুদ্ধও নয়, তাহলে এই হাড়-হিম করা আতঙ্কের ঘটনা কেন ঘটানো হোল? আর দেশবাসীর প্রশ্ন, রাজ্যপালের এই উদ্বেগের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁকে তিরস্কার করে কেনই বা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেবকে সমর্থন করতে নির্দেশ দিলেন? বাস্তবে ঐদিন কি ঘটেছিল?

সিপিএম দলের বেনামে পরিচালিত ২ টি টিভি মাধ্যম ও তাদের ১ টি সংবাদপত্র ছাড়া কোন সংবাদমাধ্যমের সংবাদদাতাদের সেই বধ্যভূমিতে যেতে দেওয়া হয়নি। তাদের আটকে দিয়ে বা মারধোর করে সিপিএম নেতাদের এবং এস পি সহ ঊর্দ্ধতন পুলিশকর্তাদের যৌথ পরিচালনায় ৩০০০ সশস্ত্র পুলিশ ও সহস্রাধিক সশস্ত্র সিপিএম ক্রিমিনালকে দিয়ে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও লাশপাচারের এক পৈশাচিক কাণ্ড ঘটানো হল ১৪ মার্চ। সঙ্গে সঙ্গে পরদিন ১৫ মার্চ পর্যন্ত চালানো হল গণধর্ষণ ও পাশবিক বিকৃত মানসিকতার যৌন অত্যাচার। সিপিএম মদতে যে সাংবাদিকরা ১৪ মার্চ বধ্যভূমিতে যায়, তাদের ক্যামেরাও পুলিশের হাতে দিতে হয়। লাশপাচারের সুবিধার জন্য সিপিএম দলের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বে প্রথাবহির্ভূত অস্বাভাবিক সময়ে ১৪ মার্চ বিকেল ৫ টা থেকে পরদিন বিকেল পর্যন্ত পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্‌ধ ডাকা হয়। বিকেল ৫ টা থেকে পরদিন বিকেল পর্যন্ত বন্‌ধ এদেশে কেউ কোনদিন শুনেছেন? কত মৃতদেহ যে ইটভাটার চুল্লিতে, নদীতে, ট্রলারে, সমুদ্রমোহনায়, জঙ্গলে বা যত্রতত্র পোঁতা বা ফেলা হয়েছে তার হিসাব নেই। এই সুযোগ বন্‌ধ ডেকে নেতারা করে দিয়েছে। সরকার ১৪ জনের মৃত্যুর স্বীকৃতি দিলেও বাস্তবে মৃত্যুর সংখ্যা কত, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, বহু মৃতদেহ হয়তো খুঁজেও পাওয়া যাবে না। বাস্তব বিভীষিকার সামান্যতম অংশই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। একটি চ্যানেলে একটিমাত্র দৃশ্য—এক কৃষক গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারছে না, তাকে ২ মহিলা তুলতে এলে পুলিশের উর্দিধারী এক যুবক এসে সেই ৩ জনকেই মাথায় সজোরে মারতে মারতে নিথর করে দেয়। বিবেকবান দেশবাসী এই একটিমাত্র ছবিই দেখে শিউরে উঠেছেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে এর বহুগুণ বীভৎস ও অগণিত ঘটনা। শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা ধিক্কারে ক্রোধে বেদনায় সোচ্চার হয়েছেন, ছুঁড়ে ফেলেছেন খেতাব ও পুরস্কার, পথে নেমেছেন। তা সত্ত্বেও নেতাদের সম্বিত নেই। বরং তারপর থেকে তারা দিনকে রাত, আর রাতকে দিন বানানোর মিথ্যা প্রচারে কুখ্যাত গোয়েবল্‌সকে হারিয়ে আবার তৃতীয় দফায় একটা বীভৎস আক্রমণের প্রস্তুতিতে সশস্ত্র খুনী সমাবেশ করছেন।

ওদের সবাই জানে, সিপিএম-এর লক্ষ্মণ শেঠ, বিজন রায়, অমিয় সাউ, হিমাংশু দাস, নির্মল জানা, অশোক গুড়িয়া সহ জেলার প্রায় সমস্ত নেতাদের এবং পুলিশের যৌথ পরিচালনায় গণহত্যা কাণ্ডের বিভীষিকা চালানো হয়েছে। তারপর চলেছে গণধর্ষণকাণ্ড ও মেয়েদের তলপেটে লাথি মারা, মূত্রনালীতে রড ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো পাশবিক কুৎসিত অত্যাচার। কত শিশুকে গলা কেটে বা পেশাদার খুনীরা পা দিয়ে শিশুর এক পা চেপে ধরে অন্য পা টেনে ছিঁড়ে দিয়ে মাটিতে পুঁতেছে তার বীভৎস বর্ণনা, গ্রামবাসীর মর্মন্তুদ কান্নার মধ্যে এলাকায় ছড়িয়ে আছে।

আর তারপর বাড়ী বাড়ী ঢুকে দু'দিন ধরে পশুর দল মেয়েদের টেনে এনে যেভাবে গণধর্ষণ চালিয়েছে, সে লজ্জার কথা সব মেয়ে বলতে পারেনি। মায়ের সামনে ১২ বছরের মেয়েকে এবং তার ২৪/২৫ বছরের দিদির কোল থেকে ২ বছরের শিশুকে কেড়ে পেটে পা তুলে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে মা, দিদি, বোনের উপরে গণধর্ষণ চালানোর ঘটনা মা-মেয়েরা বলেছেন।

অদ্ভুত কাণ্ড হল, ১৪ মার্চের গণহত্যার পরেই কর্তৃপক্ষ পুলিশের কাছে নির্দেশ পাঠায়, পুলিশকে অস্ত্র ছাড়া নন্দীগ্রামে পাহারা দিতে হবে। এতে পুলিশরা বিক্ষোভ দেখিয়ে সংবাদমাধ্যমকে বলে, সিপিএম কর্মীরাই পুলিশকে খুন করে আন্দোলনকারীদের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আবার মারাত্মক আক্রমণের ছক কষছে। পুলিশই সংবাদমাধ্যমের কাছে এই তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে, যা রাইখস্ট্যাগে আগুন ধরানোর হিটলারী পরিকল্পনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা যেহেতু ফাঁস হয়ে গেছে, তাই অন্য কোনভাবে প্রতিহিংসা মেটাতেই হবে নেতাদের। রক্ততৃষ্ণা তাঁদের মেটেনি, আরো কত হত্যা করলে যে তাদের চাষী-মজুর-গরীব নিধনের 'উন্নয়ন' শেষ হবে তা ভেবে নন্দীগ্রামের মানুষ আতঙ্কিত।

সিপিএম নেতারা এখন কি বোঝাচ্ছেন

পার্টির নেতারা এখন প্রচার করছেন যে, মাওবাদীরা এই আন্দোলনে সক্রিয়। তারাই সাড়ে ৪ টি অঞ্চলকে ঘিরে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ১৪ মার্চ মেয়েদের ও শিশুদের ঢাল হিসাবে এগিয়ে দিয়ে পেছন থেকে গুলি করে মেরেছে মাওবাদীরাই। আর বলছেন, ঐ অঞ্চলগুলোর সিপিএম কর্মীদের তাদের পরিবার সমেত গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের তো এলাকায় যেতে দিতে হবে। তাই পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে, কিন্তু পুলিশের গুলিতে কেউ মরেনি ইত্যাদি। আশ্চর্যের বিষয়, বিমান বসু, বিনয় কোঙারের মতো জাঁদরেল নেতারা কিন্তু প্রকাশ্যে বলেছেন, পুলিশ গুলি চালিয়ে ঠিকই করেছে। পুলিশকে ঢুকতে দেয়নি—তারা কি ফুল ছুঁড়বে? তাহলে নেতাদের কথামতো তো কৃষক হত্যাটা ঠিকই হয়েছে, আর গোপনে প্রচার চালাচ্ছেন, মাওবাদীদের কাণ্ড। আবার চতুর নেতাদের একজন বলছেন, ভুল হয়েছে; অন্যজন বলছেন, ঠিকই হয়েছে। কোন্‌টা ভুল, কোন্‌টা ঠিক, তা কিন্তু বলছেন না। ৩ দিন ধরে দিল্লীতে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটি বহু ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, নন্দীগ্রামে ভুল হয়েছে। কিন্তু কোন্‌টা কোন্‌টা ভুল, তা কেন্দ্রীয় কমিটিও ঠিক করতে পারেনি। সেটা ঠিক করার ভার দিয়েছে রাজ্য কমিটিকে। এটাও এক বিচিত্র সিদ্ধান্ত।

সিপিএম নেতারা গত ৩০ বছরে রাজ্যবাসীকে একটি অভিজ্ঞতা দিয়ে দিয়েছেন, তা হচ্ছে, এই নেতারা কক্ষনো সত্য বলেন না। আর ধরা পড়লেই ভুল স্বীকার করেন। কিন্তু তবু এখন আমরা সত্যটা বুঝতেও জানতে চাই। বাস্তবে নন্দীগ্রামে নকশালপন্থী বা মাওবাদী কোন সংগঠন এখনও নেই। মাওবাদীরা তো বেলপাহাড়িতে সিপিএমের ২ নেতাকে খুনের দায় স্বীকার করে বলেছে, তাদের নন্দীগ্রামে সংগঠন না থাকায় কৃষক হত্যার প্রতিশোধ তারা এভাবে নিল। এস ইউ সি আই এই পন্থায় বিশ্বাসী নয়, কিন্তু মাওবাদীদের যে নন্দীগ্রামে কেউ নেই তা বোঝা গেল। কলকাতার ২/৪ জন নকশাল কর্মী ৭ জানুয়ারীর ঘটনার পরে নন্দীগ্রামে যাতায়াত করছেন, কিন্তু এলাকায় বাস্তবে কোন সংগঠন তাদেরও নেই। মিডিয়ার প্রভাবকে ভিত্তি করে সমর্থন ও কিছুটা সংগঠন আছে তৃণমূল কংগ্রেসের। আর পুরনো কংগ্রেসীদের মধ্যে কিছু

ব্যক্তির সামান্য প্রভাব আছে। আর সম্প্রতি মাদ্রাসাগুলিকে কেন্দ্র করে জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ কাজ শুরু করেছে। নন্দীগ্রামে বামপন্থীদের মধ্যে সিপিএম সিপিআই'র যেমন সংগঠন আছে, তেমনই ৩০ বছর ধরে সদাসক্রিয় এস ইউ সি আই জনগণের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধার আসন নিয়ে আছে। সিপিএম নেতারা ও পুলিশের গুপ্তচর বিভাগ ভালভাবেই এ খবর জানে, তবু কৃষক গণহত্যার ঘৃণ্য অপরাধ কর্মী সমর্থকদের কাছে ঢেকে রাখতে চতুর সিপিএম নেতারা বলছেন, এটার সঙ্গে মাওবাদীরা আছে।

টিভি ও সংবাদমাধ্যমের একাংশ এমনভাবে প্রচার করছে, যেন নারী শিশুকে সামনের সারিতে রাখাটাই আন্দোলনকারীদের অন্যায়। তাহলে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা শহীদ মাতঙ্গিনী সহ শত শত মহিলাকে এবং প্রীতিলতা, শান্তি, সুনীতিদের লড়াইতে সামনে রেখে মহা অন্যায় করেছিলেন। রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামে মহিলারা সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে কী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছেন, তা কেউ ভুলে যাননি। নন্দীগ্রামের স্থানীয় মানুষ ভেবেছিল, নারী শিশুকে সামনে দেখলে নৃশংস পুলিশবাহিনীও কিছুটা সংযত হতে পারে। কিন্তু ১৪ মার্চ পুলিশের উপর নির্দেশ ছিল, কোন কিছু বিচার করা চলবে না—যত মরে মরুক, লাশ পাচার করা হবে, চালাও গুলি। এই ঘটনার আগে জেলা পুলিশ সুপার অশোক দত্তকে বদলি করে শ্রীনিবাসনকে নিয়ে আসা হোল কেন? কারণ কি এই যে, অশোক দত্ত এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা মানতে পারেন নি? কর্তাভজা বলে পরিচিত শ্রীনিবাসনের বিরুদ্ধে দুটি অপকর্মের অভিযোগ আছে। তাই পুলিশমন্ত্রীর অনুগ্রহ পেতে মরিয়া তাকে দিয়ে যেকোন কাজ করানো যাবে, এটাই কি সিপিএম নেতারা মনে করেছেন? নারী শিশুরা সামনের সারিতে থাকলে তাদের উপরে গুলি চালাতেই হবে কোন্ যুক্তিতে? আর তাদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে আন্দোলনকারীরাই তাদের গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে, এই হাস্যকর মিথ্যা সিপিএম দলেরও কাউকে কি বিশ্বাস করানো যাবে? বলা ভাল, ১৪ মার্চের ঘটনায় সরকার-স্বীকৃত নিহত ১৪ জনের মধ্যে ২ জন মাত্র মহিলা, ১২ জন পুরুষ এবং গুলিবিদ্ধ ও আহত ২০০০ জনের মধ্যে ১৭০০-র বেশী পুরুষ। তাহলে কি বোঝা যায়? তৃতীয় কথা হলো, যদি কাল্পনিক মাওপন্থীরা মেয়েদের ঢাল হিসাবে রেখে গুলিই চালায়, তাহলে কেন একজনও পুলিশ মারা গেল না, গুলিবিদ্ধও হলো না? এটা কি কখনও সম্ভব? তাছাড়া কোন সংবাদমাধ্যমে, এমনকি কোন রিপোর্টেই আন্দোলনকারীদের তরফ থেকে গুলি চালানোর খবর নেই। তমলুক জেলা হাসপাতালে যে গুলিবিদ্ধ নারী পুরুষরা আছেন (বা ছিলেন) তাদের সামনে লক্ষ্মণ শেঠ বা জেলাশাসক বা সিপিএম-ফ্রন্টের নেতারা দেখা করতে এলে আহত মহিলারা তাদের যে ঘৃণা ও ধিক্কারে তাড়িয়ে দিয়েছেন—তা কি প্রমাণ করে? চতুর্থত ১৪ ও ১৫ মার্চ গোকুলনগরের যাঁরা গণধর্ষিতা, তাঁরা সংবাদমাধ্যমে ও থানায় ডাইরীতে ঐ গ্রামেরই চিহ্নিত সিপিএম ক্রিমিনালদের নাম বলেছেন। চূড়ান্ত মিথ্যাচারে অভ্যস্ত সিপিএম নেতারাও এই ক্রিমিনালদের বাঁচাতে তাদের স্বপক্ষে কি কোন যুক্তি দিতে পারবেন?

এতটুকু অনুশোচনা নেই সিপিএম নেতাদের! দলকে তাঁরা কোথায় নিয়ে গেছেন? কর্মীদের বিরাট অংশকে নীতি-আদর্শহীন চাওয়াপাওয়ায় বন্দী করে, অথবা পঞ্চায়েতী সুবিধা সুযোগের লোভে ফাঁসিয়ে বা তোলাবাজ ক্রিমিনাল এবং পুলিশী প্রশ্রয়ে মস্তান বানিয়ে, বাকী সমর্থক

জনগণকে নানা ফাঁদে হুমকিতে ভয়ে ত্রাসে কুঁকড়ে দিয়ে গদীর জন্যে তারা সবরকম নোংরামি করছেন, আর সংস্কৃতি রুচি সব পায়ে মাড়িয়ে কর্মীদের প্রশ্রয় দিয়ে অধঃপতিত করছেন। ভাবছেন এর ফল কোনদিন তাঁদের ভোগ করতে হবে না? নিজেরাও জানেন, গদী মসনদ রক্ষা করতে হলে আজ গরীবের স্বার্থ দেখলে হবে না। বেপরোয়া সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আজ এদেশীয় লুঠেরা ধনকুবেররা চাষী মজুরের সর্বস্ব কেড়ে নিতে মরিয়া। তাদের বিরুদ্ধে গরীবের স্বার্থ নিয়ে লড়তে গেলে হিম্মত চাই। আর চাই, মার্কসবাদী আদর্শের পথে সংগ্রামী চরিত্র গড়ে তোলা ও দলকে চালানো। আর এ কাজ করলে ঐ শোষকেরা প্রচারমাধ্যমে নেতা বানিয়ে টাকার পাহাড় দিয়ে মস্তান ও প্রশাসনের মদতে গদীতে বসাবে না। ওদের সেবা করলে গদী, না হলে গদী কেড়ে নিয়ে সে জায়গায় অন্যদের বসাবে। নেতারা তাই ঠিক করে নিয়েছেন, মার্কসবাদ নয়, পুঁজিবাদবিরোধী শোষণমুক্তির বিপ্লব নয়, বরং পুঁজিবাদকেই সেবা করতে হবে। কারণ, গদী চাই—তাতে গরীব মরে মরুক। তাই বিশ্বায়নের দাপটে চা-বাগানের হাজার হাজার শ্রমিক মৃত্যুর গহ্বরে, দেড় লক্ষ চাষী (তার মধ্যে এ রাজ্যের কয়েকশ') আত্মহত্যা করেছে। আমলাশোল সহ গ্রামে গ্রামে অনাহারের মৃত্যুমিছিল। নেতারা গদীতে বসে নির্বিকার। কর্মীদের বোঝাচ্ছেন—গদী গেলে সুযোগ সুবিধা চলে যাবে—গদী রাখতে হলে পুঁজিবাদকে সেবা করতেই হবে। কর্মীরাও এই প্রশ্ন করছেন না যে, গরীব নিধন করে হলেও বিপ্লবী দলকে গদীতে থাকতেই হবে কেন? নেতারা যেমন গদীছাড়া হওয়ার কথা ভাবলেই ভয় পায়, সুবিধাভোগী কর্মীরাও ভয় পায়। আসলে এই সব নেতা-কর্মী সবাই জানে, দলটা পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। তাই কৃষক হত্যা ও গণধর্ষণ হলেও তারা মুখ বুজে থাকে।

সিপিএম নেতারা এত অমানবিক ও নিষ্ঠুর যে, ধর্ষিতা ও আহতদের হাসপাতালেও চিকিৎসার সুযোগ দেয়নি। শত শত মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকলেও তাদের চিকিৎসার জন্য তুলে আনতেও নরপিশাচরা বাধা দিয়েছে। তবুও সমস্ত বাধা তুচ্ছ করে আহতদের বধ্যভূমি থেকে ১১ কিমি দূরে নন্দীগ্রাম হাসপাতালে আনা হয়েছে। এত বিপুলসংখ্যক আহতদের চিকিৎসা করার মত পরিকাঠামো নন্দীগ্রাম ব্লক হাসপাতালে নেই। এই অবস্থায় হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসার তদারকিতে কমরেড নন্দ পাত্র দলের ও ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির কর্মীদের নিয়ে এগিয়ে আসেন। আমাদের দলের কর্মী কমরেড অসিত জানা, আরতি খাটুয়া, ইতি জানা সহ ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা আহতদের সেবায় দিবারাত্র পরিশ্রম করেন। রক্তাপ্লুত আহতরা ৮/১০ ঘণ্টা কোন পানীয় জল পর্যন্ত পায়নি। এই কর্মীরা হরলিক্স কিনে পার্টি অফিসে তা বানিয়ে হাসপাতালে বিলি করেন। গুরুতর আহতদের অনেককে তমলুক হাসপাতালে পাঠাতে চাপ দেন। তমলুক হাসপাতালে আমাদের দলের তমলুক শহরের কমরেডরা প্রত্যেকদিন দু'বেলা আহতদের চিকিৎসার অব্যবস্থার প্রতিকারে ও আহতদের সাহায্যে মাসাধিককাল ধরে সর্বদাই সক্রিয় ছিলেন। তাদের চাপেই সরকারী বহু কারচুপি ধরা পড়ে।

১৫ মার্চ আমাদের দলের ও রাজ্য কমিটির সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দল কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার (পরিষদীয় নেতা), কমরেড সলিল চক্রবর্তী, ট্রেড ইউনিয়নের সর্বভারতীয় নেতা কমরেড শঙ্কর সাহা, বিদ্যুৎ আন্দোলনের নেতা কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস, কমরেড সুজিত ভট্টশালী

তমলুক হাসপাতালে আহতদের সাথে দেখা করেন, চিকিৎসার খোঁজখবর করেন, হাসপাতালের সুপারের সাথে দেখা করে চিকিৎসার নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ১৬ মার্চ তাঁরা নন্দীগ্রাম হাসপাতালে যান। সেখানে আমাদের মহিলা কর্মীদের কাছ থেকে তাঁরা জানতে পারেন, শুধু গুলিগোলা চালিয়ে হামলা নয়, মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে পুলিশ ও সিপিএম হার্মাদ বাহিনী। এমনই অত্যাচারিত দুই মহিলা নন্দীগ্রাম হাসপাতালে আছেন। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার মহিলাদের সাথে কথা বলেন এবং ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসারকে বুঝিয়ে তাদের উপযুক্ত পরীক্ষার জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

১৬ মার্চ আমাদের দলের মেডিক্যাল ইউনিট ও মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের ডাক্তার ও নার্সদের একটি বড় দল নন্দীগ্রাম হাসপাতাল ও নন্দীগ্রামের আক্রান্ত এলাকায় যান। ১৬-১৭ মার্চ দুদিন ধরে দুই সহস্রাধিক আহতকে চিকিৎসা করেন। দেড় মাসের বেশী সময় ধরে চিকিৎসকরা বহু সংখ্যক চিকিৎসা শিবিরের মাধ্যমেই আহতদের সুস্থ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাছাড়া অত্যাচারের বীভৎসতা সম্পর্কে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা কলকাতা হাইকোর্ট এবং রাজ্যপালকে জানান।

১৭ মার্চ মেধা পাটকরের নেতৃত্বে দিল্লী সহ বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ নন্দীগ্রাম যান। এদের সাথে ছিলেন আমাদের দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। এই প্রতিনিধি দল নন্দীগ্রাম থেকে ফিরে এসে জেলাশাসকের সাথে দেখা করেন। তমলুক হাসপাতালেও আহতদের সাথে তাঁরা দেখা করেন। ২১ মার্চ 'শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ'-এর পক্ষ থেকে ৩২ জনের এক প্রতিনিধি দল নন্দীগ্রাম হাসপাতালে আহতদের সাথে দেখা করে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যান। সেখানে নির্যাতিত মহিলা সহ আহতদের সাথে এবং নিহত পরিবারের লোকজনদের সাথে কথা বলেন। পরে তমলুক হাসপাতালেও আহতদের সাথে দেখা করেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, নাট্যশিল্পী শাঁওলী মিত্র, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, পল্লব কীর্তনীয়া, অধ্যাপক তরুণ নস্কর, অধ্যাপিকা চৈতালী দত্ত, তপন রায়চৌধুরী, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ ব্যানার্জী, পবিত্র গুপ্ত, অর্পিতা ঘোষ, ডাঃ তরুণ মণ্ডল, অমিতাভ চ্যাটার্জী, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, সান্টু গুপ্ত প্রমুখ।

৭ জানুয়ারীর পর থেকে একটানা ৪ মাস ধরে রাতের পর রাত পাহারা দিয়েছেন সাধারণ শত শত কৃষক ও সাহসী যুবক-দল। উপর্যুপরি বোমা বন্দুকের হামলাকে প্রতিহত করতে প্রাণ তুচ্ছ করে যুবকদের নিয়ে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ বাহিনী বারবার অসমসাহসে ও তৎপরতায় তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে—যা অবিস্মরণীয়। প্রচণ্ড শারীরিক-মানসিক চাপ নিয়ে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতারা সহ নিশিকান্ত মণ্ডল, সবুজ প্রধান, সোয়েম কাজি, স্বদেশ দাস, স্বদেশ অধিকারী, বিরাজ জানা, সেখ জাহাঙ্গিরকে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। আর নানা ধরণের আক্রমণ, রাজনৈতিক চাপ ও অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে উদ্ভুত নানা জটিল সমস্যায় ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সংহতি বজায় রাখা ও জনগণের নানাবিধ অসুবিধায় সহায়তা করার কাজে দিনরাত নন্দীগ্রামে আমাদের দলের কর্মীদের প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়েছে। জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস নন্দ পাত্র, ভবানী দাস সহ আনসার হোসেন, অসিত প্রধান, আরতি খাটুয়া, মনোজ দাস, অসিত জানা, বিমল মাইতি প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কর্মীদের অসাধারণ

নিষ্ঠার কথা আজ মানুষের মুখে মুখে। বাংলার ও সর্বভারতীয় বহু বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এই দুঃসময়ে নন্দীগ্রামের সংগ্রামরত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু যে দু'জন মানুষ এই সংগ্রামকে বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে মদত করতে প্রতিনিয়ত পাশে থেকেছেন, তাঁরা হলেন এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা ও তৃণমূল বিধায়ক শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

হাসপাতালে সমাধিস্থ হলো চিকিৎসা ও চিকিৎসকের নৈতিকতা

ভিন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ হলেও যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা হয়। কিন্তু এ কী সাংঘাতিক কাণ্ড! নন্দীগ্রামের হাসপাতালে হোক, আর তমলুক জেলা হাসপাতালে, বা কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে হোক—সর্বত্র সিপিএম নেতাদের হুমকি ও মৌখিক নির্দেশে চিকিৎসকরা তটস্থ। চিকিৎসার নামে অবহেলা, ভুল ও মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে আঘাত লঘু করে দেখানো, ধর্ষিতাদের পরীক্ষা না করা, এমনকি তাদের অভিযোগ সত্ত্বেও রিপোর্টে ধর্ষণের পরিবর্তে 'সাধারণ আঘাত' লেখা, গুলির আঘাতকে ইটের আঘাত লিখতে নেতাদের পক্ষ থেকে চাপ দেওয়া, চিকিৎসা না করে বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি চলতে থাকে। তমলুকে ''হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি'' আন্দোলন শুরু করে চাপ দিলে একজন চিকিৎসক যথাযথ চিকিৎসা করতে আসেন। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় জেলা পরিষদ সভাপতি ও সিপিএম নেতা নিরঞ্জন সিহি সেই চিকিৎসককে অন্যত্র সরিয়ে দেন।

১৪ মার্চ কাঁদানে গ্যাসের সঙ্গে এমন কিছু গুঁড়ো দেওয়া হয়েছে যাতে শত শত মানুষের দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে, এলাকার বহু পাখি মারা গেছে। তাছাড়া একটানা ৩ মাস ধরে বোমা ও গুলির আওয়াজে এবং শত শত মানুষকে গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত হতে দেখে এবং পৈশাচিক পদ্ধতিতে মানুষকে খুন করতে দেখে গ্রামবাসী অনেকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন। এছাড়া গুলিবিদ্ধ হয়ে বহু মানুষ পঙ্গু হয়ে গেছে। ধর্ষিতাদের শারীরিক মানসিক আঘাত রয়েছে। সরকারের উচিত ছিল, বিনা পয়সায় পরীক্ষা ও ওষুধ সহ বিশেষ চিকিৎসা শিবির চালানো। তা তো সরকার করলোই না, বরং যাঁরা সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হলেন তাদের চিকিৎসা না করে ছেড়ে দেওয়া বা ধর্ষণের মতো কুৎসিত অপরাধকে আড়াল করতে মিথ্যা রিপোর্ট লেখার মতো অমার্জনীয় অপরাধ করল। এ তো চিকিৎসকদের যে নৈতিকতার শপথ নিতে হয়, তাকেই ভয় ও ত্রাসের চাপে সমাধিস্থ করতে চিকিৎসকদের বাধ্য করা। এটা কি চলতে দেওয়া যায়? এটা তো হিটলারী ফ্যাসিবাদেরই অনুকরণ।

মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী কি চাইছেন

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নাটকীয়ভাবে আবার সমস্ত কিছুর দায় নিজেই নিয়েছেন। ন্যূনতম সততা থাকলে তাঁর উচিত ছিল প্রথমেই ৭ জানুয়ারীর গণহত্যার পরিচালক ও উস্কানীদাতা সমস্ত নেতাসহ অপরাধীদের এবং ১৪ মার্চের গণহত্যা ও গণধর্ষণ কাণ্ডের যৌথ অভিযানের পরিচালক পুলিশ অফিসারদের ও সিপিএম নেতাদের সহ সশস্ত্র এই সরকারী ও বেসরকারী বাহিনীর যারা প্রত্যক্ষ অপরাধী তাদের গ্রেপ্তার ও বিচারের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত খেজুরী প্রান্তে সশস্ত্র ক্রিমিনালদের গ্রেপ্তার ও বোমা-গুলিবর্ষণ বন্ধ করা, নন্দীগ্রামের আক্রান্ত মানুষদের আস্থা অর্জনের জন্য যথার্থ শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, তৃতীয়ত নিহত ও আহত

পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া, জনগণের ও আন্দোলনকারী নেতাদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা বন্ধ করা এবং সর্বোপরি তাঁর সরকারের পদত্যাগ করা।

মুখ্যমন্ত্রী মুখে বলছেন, দায় আমার—কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বীকারোক্তি কোন্ উপকারে লাগবে নিহত, ধর্ষিতা, আহত মানুষগুলির? গণহত্যার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর আচরণে কোথাও কোনও দুঃখবোধ লক্ষ্য করা যায়নি। বরং তিনি এই হত্যাকাণ্ডের সাফাই গেয়ে বলেছেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এই পুলিশী অভিযান। অর্থাৎ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই তাঁরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। কার আইন? কিসের শাসন? যখন দিনের পর দিন সিপিএম ক্রিমিনাল বাহিনী চারিদিক ঘিরে নন্দীগ্রামের ওপর বোমাবাজি সহ আক্রমণ চালিয়েছে, মেধা পাটকর সহ খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবিদের নন্দীগ্রামে ঢুকতে বাধা দিয়ে তাঁদের সাথে কুৎসিত আচরণ করেছে, নন্দীগ্রামকে ঘিরে তল্লাসি শিবির খুলে বাইরে থেকে নন্দীগ্রামে মানুষের যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিয়েছে, ফেরি বন্ধ করে গরীব মানুষকে রুজি রোজগারে বেরোতে না দিয়ে কার্যত অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করেছে, তখন কোথায় ছিল মুখ্যমন্ত্রীর আইনের শাসন? ৭ জানুয়ারীর হত্যাকাণ্ডের দিন কোথায় ছিল মুখ্যমন্ত্রীর আইনের শাসন? মুখ্যমন্ত্রীর 'ভুল স্বীকারে' হত্যাকারীদের বিচার ও শাস্তির কথা নেই কেন? আসলে চারিদিক থেকে নন্দীগ্রামকে অবরুদ্ধ করে, ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়েও যখন নন্দীগ্রামের মাথা তাঁরা নত করাতে পারলেন না, তখন আরও বড় আক্রমণ নামিয়ে আনতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও ক্রিমিনাল-বাহিনী গোটা রাজ্য থেকে তুলে এনে খেজুরীতে জড়ো করলেন এবং ১৪ মার্চ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটালেন। সি বি আই তদন্তকারী দলের হানায় খেজুরীর জননী ইটভাটায় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, পার্টি প্যাড, রসিদ, মেয়েদের অন্তর্বাস পাওয়া সত্ত্বেও খেজুরীর ওসিকে দিয়ে সব চেপে দেওয়া হল কার নির্দেশে? যে দশজন সশস্ত্র সিপিএম কর্মীকে সি বি আই গ্রেপ্তার করেছে তারা স্বীকার করেছে, সিপিএম নেতারা তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে খুনী হিসাবে ভাড়া করে নিয়ে এসেছিল। তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে সিপিএম নেতাদের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ৪ খানা বন্দুক ও সিপিএম নেতাদের প্যাডে আক্রমণের পরিকল্পনার নির্দেশ। অথচ এই নেতাদের কাউকে গ্রেপ্তার করা হলো না কেন? এমনকি মুখ্যমন্ত্রী তাঁর স্বীকারোক্তিতে কোথাও এসব বিষয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। উল্লেখ করেননি দলীয় ক্রিমিনালদের জড়িত থাকার কথা। বরং তাঁর দল যখন আবার তৃতীয় দফায় নৃশংস আক্রমণের জন্য সশস্ত্র হার্মাদবাহিনীকে জড়ো করছে, তিনি নির্বিকার, যেন কিছুই জানেন না।

কেন্দ্র রাজ্য গলাগলি

অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, সিপিএম দল ৬০ জন এম পি নিয়ে সমর্থন করায় কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় বসেছে এবং একদিনের 'প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ার দালাল' কংগ্রেস আজ তাদের পরম বন্ধু ও প্রগতিশীল হয়ে গেছে, তারা পরস্পর একে অপরের অপকর্মকে লোকদেখানো সমালোচনা করে জনগণকে ঠকিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যে নিজের নিজের গদী সামাল দিচ্ছে। তাই নন্দীগ্রামের গণহত্যায় শিহরিত রাজ্যপালকে মন্তব্য প্রকাশের জন্য তিরস্কার করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেবকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন

সিবিআই কতটা কি করবে, তা এই নির্দেশ থেকেই বুঝে নেওয়া যায় (যেমন তাপসী মালিকের খুন নিয়ে তারা কিছুই করে নি)। এই শক্তিতে বলীয়ান বুদ্ধবাবু সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দিল্লিতে দেখা করলে 'সন্তুষ্ট' সোনিয়াজী বুদ্ধবাবুকে বলেছেন, এ রাজ্যে 'বিরোধী' ভাবমূর্তি বজায় রাখতে কংগ্রেস কিছু কর্মসূচী নেবে, তার বেশী নয়। অর্থাৎ নাট্যমঞ্চে ভাবমূর্তি রক্ষার অভিনয় হবে। এই অবস্থায় জনগণের সংগ্রামী ঐক্য ও আপোষহীন সংগ্রামই একমাত্র ভরসা। আজ যে কেন্দ্র ও রাজ্যকে 'সেজ' (বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল) নিয়ে নতুন করে কিছু পরিবর্তনের কথা ভাবতে হচ্ছে এবং শেষপর্যন্ত নন্দীগ্রামে জমি না নেবার যে লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় হলো —এগুলি এই মহান ঐতিহাসিক সংগ্রামের বিরাট জয়, কেন্দ্র-রাজ্য ঘৃণ্য মিতালি সত্ত্বেও অপ্রতিরোধ্য জনশক্তির জোরে যে জয় অর্জিত হল।

আন্দোলনকারীরা কি উন্নয়ন বিরোধী বা শিল্পবিরোধী

নন্দীগ্রামের মানুষ যে উন্নয়ন চায় সেকথা তারা ২৫ বছর আগেই, সিপিএম সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার ৫ বছর বাদেই ১৯৮২ সালে 'নন্দীগ্রাম উন্নয়ন পর্ষদ' নামে ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ তৈরী করে সংগ্রাম করে প্রমাণ করেছে। আমাদের দল সেই আন্দোলনের অন্যতম মূল কর্ণধার ছিল এবং সেদিনও সিপিএম নেতাদের নির্দেশে পুলিশ গুলি চালিয়ে তরুণ ছাত্র সুদীপ্ত তিয়াড়িকে হত্যা করেছিল। সেদিনও মানুষ রাস্তা কেটে বড় পুলিশী আক্রমণ থেকে নন্দীগ্রামের সংগ্রামীদের বাঁচিয়েছিল। এই আন্দোলনে নন্দীগ্রামের জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী রূপ দেখেই সিপিএম নেতৃত্বকে ভাবতে হয় এবং যে নন্দীগ্রামে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের যুগে বিয়াল্লিশের বিদ্রোহে থানা দখল করতে গিয়ে ১৯ জন শহীদ হয়েছেন, তবু স্বাধীনতার পর সেখানে রাস্তা, বিদ্যুৎ, সেচ ব্যবস্থা কিছুই হয়নি, সেখানে এই আন্দোলনের ধাক্কায় কিছু রাস্তা, কালভার্ট, কিছু অংশে বিদ্যুৎ আনতে তারা বাধ্য হয়।

সারা দেশের মতো এ রাজ্যেও আজ উন্নয়নের বন্যা (!) দেখে যেকোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই আতঙ্কিত। চা-বাগানে, আমলাশোলে, রাজ্যের থানায় থানায় গরীব বস্তিতে, আর ৫৬ হাজার বন্ধ কারখানার ছাঁটাই-শ্রমিক বস্তিগুলিতে অনাহারের মৃত্যুমিছিল, হাহাকার। ফসলের দাম না পেয়ে চাষীর কান্না ও আত্মহত্যা। সারা ভারতে মেয়ে ও শিশু পাচারের স্বর্গ হিসাবে পরিচিত এই রাজ্য। লাখে লাখে বাপ মা খেতে দিতে না পেরে মেয়েকে বিয়ের নামে বা কাজের নামে অজানা অচেনা লোকের হাতে তুলে দিচ্ছে—তারা আর ফিরছে না। সারা দেশে এ রাজ্য শিক্ষায় ১৯তম স্থানে, শিশুমৃত্যু ও চিকিৎসার অব্যবস্থায় দ্বিতীয়, রাজনৈতিক খুনে প্রথম, নারীধর্ষণে দ্বিতীয়, আর দুই কোটি বেকার-অর্ধবেকার। উপরন্তু যৌন শিক্ষা, ঢালাও মদ, যৌন প্রবৃত্তিসর্বস্ব উন্মাদনা ছড়িয়ে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ক্ষুদিরাম-দেশবন্ধু-রবীন্দ্র-শরৎ-নজরুল প্রমুখ মনীষীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করা হচ্ছে। অন্যদিকে একদল টাকা আর সম্পদের পাহাড়ের পর পাহাড় বানাচ্ছে। নন্দীগ্রাম এই ধোঁকা ধরে ফেলেছে। শিল্পায়নের ধোঁকাও তারা ধরে ফেলেছে। তাই তারা বলেছে, নন্দীগ্রামে পরিত্যক্ত জেলিংহাম এলাকায় কারখানা হোক, চাষীর জমিতে নয়। বাস্তু উচ্ছেদ করে নয়।

কেমিক্যাল হাবের নামে নন্দীগ্রামে কি করতে যাচ্ছিল

সালিম নামে ইন্দোনেশিয়ার লক্ষ লক্ষ কম্যুনিষ্ট নিধনের নায়ক ধনকুবের কোম্পানীর

পরিকল্পনা হচ্ছে, নন্দীগ্রামের ৬০/৭০ হাজার লোকের বাসস্থান উঠিয়ে জমিকে ভরাট করে রাস্তা বিদ্যুৎ ইত্যাদি করে দিয়ে রাসায়নিক কারখানা করার জন্য বিক্রি করবে। ঐ কোম্পানীই হলদিয়ায় ও মহিষাদলে রাস্তা ব্রীজ ও উপনগরী বানাবে। বনগাঁর বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে বিশাল চওড়া রাস্তা এসে রায়চকে ব্রীজ বানিয়ে হলদিয়া নন্দীগ্রাম হয়ে উড়িষ্যায় চাঁদিপুর মিলিটারী ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপন ঘাঁটি হয়ে চলে যাবে। অনেকে বলছেন, ডাউ (DOW) নামে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে ধিক্কৃত, ২০ হাজার মানুষ হত্যার বিষাক্ত রাসায়নিক তৈরীর দায়ে অভিযুক্ত, কুখ্যাত যে কোম্পানীর হাতে রাসায়নিক কারখানার জন্য নন্দীগ্রামকে তুলে দেওয়া হবে, সেটি নাপাম বোমা সহ মারাত্মক বিষাক্ত মারণাস্ত্রের রাসায়নিক তৈরী করে। আমেরিকা এই নাপাম বোমা দিয়ে ভিয়েতনামে হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীকে হত্যা করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ইরাক, আফগানিস্থান সহ বিভিন্ন দেশে আক্রমণ ও গণহত্যার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ না করে ভারত তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে। ভারত রাষ্ট্র যে নিজেই সাম্রাজ্যবাদী হয়ে গেছে, তারা এদেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি শোষকদের স্বার্থে, বিশ্ববাজারের ভাগবাঁটোয়ারায় নিজেদের শক্তিকে সংহত করছে এবং এই উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে নিচ্ছে। তাই অনেকেরই আশঙ্কা, 'কেমিক্যাল হাব'-এর নামে বাস্তবে বিষাক্ত মারণ-রাসায়নিক তৈরী হবে। এর প্রকোপে ও বর্জ্যের দ্বারা উপকূলসহ এইসব এলাকার মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, মাছ, গাছপালার মারাত্মক সর্বনাশ হবে। আর যুদ্ধপ্রস্তুতির এই পথেই চাষের জমি, মানুষের বাসস্থান সব কেড়ে নিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি পর্যন্ত ও অন্যান্য দেশের সীমান্ত ও সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত চওড়া রাস্তা তৈরী হবে এবং সংরক্ষিত হয়ে যাবে। নদীতে ও সমুদ্রে মাছ ধরা নিষিদ্ধ হবে। বাস্তবে এটি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা। এই রাজ্যে গোপনে এগুলি রূপায়িত করার পুরস্কার নিশ্চয়ই রাজ্যের ক্ষমতাসীন নেতারা পাবেন। কিন্তু মানুষ মানবে কেন? গণতান্ত্রিক দেশে মানুষের জানার অধিকার থাকবে না কেন? কেন স্বচ্ছতা নেই? কেন 'সেজ' বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নামে চাষী উচ্ছেদ করে লুণ্ঠনকারী পুঁজিপতিদের কর ছাড় এবং ন্যূনতম মজুরীর আইনগত বাধা তুলে দিয়ে ইচ্ছামতো মজুরী নির্ধারণের মাধ্যমে নির্মম শ্রমিক শোষণের ও যখন তখন ছাঁটাইয়ের বিশেষ অধিকার দেওয়া হচ্ছে? অন্য প্রদেশে মৌখিক বিরোধিতা দেখালেও এ রাজ্যে সিপিএম নেতারাই 'সেজ' চক্রান্তের অংশীদার। তবে কেমিক্যাল হাব অন্যত্র যেখানেই হোক, কৃষিযোগ্য জমিতে বা মানুষের বাসস্থান উচ্ছেদ করে হলে যেমন তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে, তেমন 'রাসায়নিক হাব'-এর নামে মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ তৈরী যে এলাকাতেই হোক, সেখানকার মানুষের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মৃত্যুর আশঙ্কার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতেই হবে। এইজন্যেই কি প্রধানমন্ত্রী ও সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে বুদ্ধবাবুর গোপন আলোচনা? প্রধানমন্ত্রী আবার বলেছেন, কেমিক্যাল হাব হবেই এবং তা হলদিয়ায় নয়, হলদিয়ার কাছেই। তাহলে কেন্দ্র-রাজ্য সিপিএম-কংগ্রেস দোস্তি কার স্বার্থে?

কৃষিকে সরকার কোন্ চোখে দেখছে

সিপিএম নেতারা প্রচার করছেন, 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'। তাঁরা প্রচার করছেন, পশ্চিমবঙ্গ কৃষিতে এক নম্বরে, এবার শিল্পে এক নম্বর হতে হবে। তাদের প্রচারের ক্ষমতা অনেক, প্রচারের জোরে তারা রাতকে দিন বানিয়ে দিতে পারেন। সত্যই কি

সিপিএম সরকারের ৩০ বছরের শাসনকালে কৃষিতে অগ্রগতি ঘটেছে! যদি ঘটেও তবে সেই অগ্রগতির পিছনে রাজ্য সরকারের কোন ভূমিকা আছে?

কৃষিতে অগ্রগতির কথা বলতে গিয়ে সিপিএম নেতারা ভূমি সংস্কারের সাফল্যের কথা বলেন। ভূমি সংস্কারের মূল কাজ খাস জমি উদ্ধার ও ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টন। সেই কাজে সিপিএম সরকারের কৃতিত্ব কতটুকু? ১৯৯৩ সালে মুখার্জী-ব্যানার্জী কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করেছিল তাতে বলা হয়েছে যে, উদ্ধার করা খাস জমির ১২ লক্ষ একরের মধ্যে ১০ লক্ষ একর উদ্ধার হয়েছিল প্রথম ও দ্বিতীয় ('৬৭ ও '৬৯ সালে) যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে। এই দুটি সরকারের মেয়াদকাল ছিল যথাক্রমে প্রথমটির মাত্র ৯ মাস ও দ্বিতীয়টির ১৩ মাস। সেই যুক্তফ্রন্টের শরিক আমাদের দল এস ইউ সি আই এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। মাত্র ২২ মাসে সেই দুটি সরকার যেখানে খাস জমি উদ্ধার করেছিল ১০ লক্ষ একর, সেখানে ১৮ বছরে সিপিএম সরকার উদ্ধার করেছে ২ লক্ষ একর খাসজমি। তাহলে খাসজমি উদ্ধারে কৃতিত্বের কথা বললে তা পূর্বতন যুক্তফ্রন্ট সরকারেরই কৃতিত্ব। সিপিএম জোট সরকারের নয়।

কৃষি উৎপাদনের অগ্রগতি নিয়ে সিপিএম নেতারা দাবী করেন, তাদের সরকারের আমলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। ৮-এর দশকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছিল একথা সত্য, কিন্তু তার কৃতিত্ব কৃষকদের, সরকারের নয়। চাষীরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে পুকুর, খাল প্রভৃতি জলাশয় থেকে জলসেচের ব্যবস্থা করে জমি দোফসলী করেছে, খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়েছে। কিন্তু ৯-এর দশক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে সার কীটনাশক ও ডিজেলের দাম বেড়েছে এবং রাজ্য সরকারও বিদ্যুতের দাম, ডিজেলের উপর সেস, পরিবহনের খরচ, জমির খাজনা বাড়িয়েছে। ফলে চাষের ব্যয় বহুগুণ বেড়েছে, অথচ চাষীরা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। কৃষকদের ধান নির্ধারিত দামে সরকার নিজে কিনে না নিয়ে তাদের দুরবস্থার মধ্যে ফেলছে। অন্যদিকে এই খাতে বরাদ্দের সিংহভাগ টাকা চালকলের মালিকদের পকেটে চলে যাচ্ছে। একদিকে ফসলের উপযুক্ত দাম না পাওয়া, অন্যদিকে সারা বছর কাজ না থাকায় চাষীদের মধ্যে দারিদ্র্য বাড়ছে এবং খাদ্যের অভাব চূড়ান্ত আকার ধারণ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, সারা বছরে কয়েক মাস খাদ্যের অপ্রতুলতায় ভোগা গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলির শতকরা হিসাবে সবার উপরে স্থান রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের (১০.৬ শতাংশ)। (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৪.৪.০৭) ন্যাশনাল সার্ভে রিপোর্ট বলছে, দেশে গ্রামীণ জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশের দৈনিক পারিবারিক আয় ১২ টাকা। (গণশক্তি) একথা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও সত্য। এই গ্রামীণ জনসংখ্যা মানে ক্ষুদ্র চাষী ও ক্ষেতমজুর। কৃষির উন্নতিতে সরকারের প্রচারিত অহঙ্কারের বেলুন এই রিপোর্টে চুপসে গেছে।

সরকারের নীতির ফলেই কৃষি আজ গভীর সংকটে। এই সংকট দেখিয়েই রাজ্য সরকার বলছে, কৃষি অলাভজনক, জমি আঁকড়ে থেকে লাভ নেই। বরং শিল্পের জন্য জমি ছেড়ে দিলে দেশের শিল্পায়ন হবে, উন্নয়ন হবে, কর্মসংস্থান হবে। কৃষির বিভিন্ন উপকরণের দাম ক্রমাগত বাড়িয়ে বাস্তবে কৃষিকে অলাভজনক করে তুলছে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার। এই প্রবল মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে গরীব ও নিম্নচাষী জমিতে হাড়ভাঙ্গা খেটে সারা বছরের খাদ্য সংগ্রহ করে।

গ্রামের মানুষ শুধু জমির উপর যেমন নির্ভরশীল নয়, আবার জমিই বংশপরম্পরায় তাদের খাদ্যের জোগানদার, এমনকি পারিবারিক শ্রমের ক্ষেত্র। তাই একে আঁকড়ে থাকা ছাড়া তাদের উপায় নেই। ফলে জমির পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ হিসাবে অনেক টাকা পেলেও মানুষ কেন জমি ছাড়তে চাইছে না, তার কারণ বোঝা কঠিন নয়। যারা বাস্তু ও কৃষিজমি হারাবে তারা যত টাকাই পাক ছিন্নমূল হবে, নতুন জায়গায় বসতি গড়ে তোলার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবে না। নন্দীগ্রামের মত এলাকায় অধিগ্রহণ হলে ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া পরিবারের সংখ্যা দাঁড়াত ১৫ হাজার, অর্থাৎ ৭০/৭৫ হাজার মানুষ। যদি ধরা যায়, শিল্প হলে ওখানকার লোকেরাই কাজ পাবে, তাহলেও ঐ এলাকায় যত বড় শিল্প গড়ে উঠুক না কেন, আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে গড়ে ওঠা শিল্পে তাদের সকলের কর্মসংস্থানের সুযোগই থাকবে না।

বুদ্ধবাবুদের 'উন্নয়ন' ও 'শিল্পায়ন' এর বাস্তব চিত্র

শিল্প যে আকাশে হয় না, একথা একটা শিশুও জানে। কিন্তু উর্বর কৃষিজমিতেই শিল্প করতে হবে কেন? কৃষিজমি ছাড়া কি শিল্প হতে পারে না? শিল্প করার জন্য রাজ্যে কি অনুর্বর, পতিত জমির অভাব আছে? রাজ্য সরকারের একথা ভাল করেই জানা আছে, এ রাজ্যে বন্ধ কারখানার সংখ্যা ৫৬ হাজারের মত। সরকারী সংস্থা 'ওয়েবকন' জানিয়েছে, ঐ ৫৬ হাজার কারখানার মধ্যে মাত্র ৫০০ টি বন্ধ কারখানার জমির পরিমাণই ৪০ হাজার একর। সহজেই অনুমান করা যায়, ৫৬ হাজার কারখানার জমির পরিমাণ কত বিপুল! এইসব বন্ধ কারখানাগুলির বিপুল পরিমাণ জমি নতুন শিল্প করার জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। এইসব জমিতে কারখানার জন্য রাস্তা, রেললাইন, জলের ব্যবস্থা সব আছে, নতুন করে করতে হবে না। এইসব কারখানার জমি স্বাধীনতার পর সরকার অধিগ্রহণ করেছিল। কিন্তু আজ এইসব বন্ধ কারখানার জমিতে নতুন কারখানা করা হচ্ছে না কেন? সরকার বলছে, মালিকরা এই জমি দিতে চাইছে না। তারা প্রমোটারি ব্যবসা করছে, বহুতল বাড়ি বানাচ্ছে। চাষের জমির মালিকানা তো সরকারের নয় চাষীর হাতে, তবে সে জমি যদি সরকার ১৮৯৪ সালের বৃটিশের তৈরী আইনে কেড়ে নিতে পারে, তো সেই আইনে কারখানার জমি নিচ্ছে না কেন?

শিল্প তো পতিত ও অনুর্বর জমিতেও হতে পারে। এ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মত জেলাগুলোতে এ ধরণের জমির অভাব নেই, যেখানে চাষ হয় না। সেখানে জল, বিদ্যুৎ, রেল বা সড়ক পথের অভাব নেই। কিছু ঘাটতি যদি থাকেও সেখানে বিজ্ঞানের যুগে তা অনায়াসেই পূরণ করা যেতেই পারে। সেখানে কেন শিল্প করা যাবে না? জামশেদপুরের পাথুরে জমিতে টাটা কারখানা করলো কিভাবে? এসব কোনও প্রশ্নেরই উত্তর সিপিএম নেতারা দেননি—শুধু বলছেন, কৃষি আমাদের ভিত্তি। তা ভিত্তিকে কবরস্থ করে তাঁরা দেশকে কোথায় পাঠাচ্ছেন? কৃষি কি ভূগর্ভে বা আকাশে হবে? না কি মার্কিনরা ইথিওপিয়া, সোমালিয়াতে কৃষি উৎখাত করে যেমন দুর্ভিক্ষ এনেছে, এদেশে তাঁরা তাই করবেন?

বুদ্ধবাবু বললেন, অনাবাদী পতিত জমি এ রাজ্যে আছে শতকরা ১ ভাগ (গণশক্তি ২০.১.০৭), তাই কৃষিজমি নিতে হচ্ছে। বুদ্ধবাবুর ঐ হিসাবও কি সত্য? তাঁর সরকারের ভূমি দপ্তরের ২০০৩-০৪ সালের স্ট্যাটাস রিপোর্টে বলছে, এ রাজ্যে পতিত জমি আছে শতকরা ৪.০৯ ভাগ। আর ভারত সরকারের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন সচিব দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখছেন, পশ্চিমবঙ্গের ''ফলিত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান ব্যুরো''র হিসাবে এ রাজ্যে অকৃষি জমি হল শতকরা ১৮ ভাগ এবং তার পরিমাণ ৩৭ লক্ষ একরের বেশী। (দি স্টেটসম্যান ২৮.১.০৭) তাহলে বুদ্ধবাবুর শতকরা ১ ভাগ অকৃষি জমির তথ্য তো সত্য নয়।

এমনিতেই শহর সম্প্রসারিত হওয়ায় কৃষিযোগ্য জমি কমছে। নদীভাঙন ও খরার প্রকোপেও জমি কমছে। তাহলে কারখানার জন্য আবার কৃষি জমি নিলে তো খাদ্য ঘাটতি পড়বেই। টাটা সালিমের পরে আম্বানির আবদার—প্রতি শহরে খুচরো ব্যবসার দোকান করতে তাকে শত শত একর জমি দিতে হবে। এরপরে অন্যরাও আসবে। সাহারাকে তো বুদ্ধবাবু সুন্দরবনের নদী জঙ্গল সহ ৯০০ বর্গকিলোমিটার জমি দেবেন বলে 'মৌ' চুক্তি করেছেন। ফলে চাষের জমি এ হারে কমতে থাকলে দেশে খাদ্যঘাটতি ও দুর্ভিক্ষ হবেই। একটা জমিকে কৃষিযোগ্য করতে বহু বছর লাগে। তাকে এভাবে ধ্বংস করাও সমাজের ক্ষতি এবং তা সামাজিক অপরাধ। বুদ্ধবাবুরা বলছেন, খাদ্যে ঘাটতি হলে কেন্দ্রের কাছ থেকে কেনা হবে, প্রচুর খাদ্য মজুত আছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, খাদ্য মজুত থাকলেও মানুষের কেনার মতো আয় না থাকলে ১৯৪৩-এর (ছিয়াত্তরের) মহাদুর্ভিক্ষের বা মন্বন্তরের মতো মানুষ পথেঘাটে মরে পড়ে থাকবে। সেদিনও প্রচুর খাদ্য মজুত ছিল, তবু ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ মানুষ মরেছিল শহরের রাস্তায় ভিক্ষে চেয়ে। সরকার ১ লক্ষ ৪৫ হাজার একর কৃষিজমি নিলে, চাষী ভাগচাষী ক্ষেতমজুর মিলে খোরাক ও জীবিকা হারিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে মরবে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের এই বক্তব্য সমর্থন করে এ কথা লিখেছেন দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। (দি স্টেটসম্যান, ২৮.১.২০০৭)

সরকারী নেতারা মুখে বলছেন, দেশের উন্নয়ন আটকে যাচ্ছে, তাই শিল্প করতে দিতে হবে। কিন্তু তাঁরা বলছেন না ৫৬ হাজার কারখানা বন্ধ কেন, যেখানে ১৭ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। আসলে কারখানা বন্ধ হওয়াটা মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে শিল্পজাত পণ্যের বাজারে মন্দার ফল। বর্তমানে সারা বিশ্বে পুঁজিবাদের এই সংকট সবচেয়ে মারাত্মক। এই অবস্থায় সিপিএম নেতারা শিল্পের বন্যা বইয়ে দেবেন বলে যা বলছেন তা জ্বলন্ত মিথ্যাচার ও প্রতারণা। টাটাদের টেলকো-টিসকোতে ৭৫ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হওয়া সত্ত্বেও এবং বেশ কিছু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঐ কোম্পানীর ১ টা কম্প্যুটার চালিত নতুন কারখানা (নগণ্য সংখ্যক শ্রমিকে) খোলার ঘটনাকে সামনে রেখে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে তাদের উদ্বৃত্ত বিপুল পুঁজি প্রোমোটারী ব্যবসায় খাটিয়ে বিপুল মুনাফা অর্জনের জন্য লক্ষ লক্ষ একর জমি গ্রাস করতে চাইছে সরকার। ধনকুবেরদের আবাসন গড়ে পুঁজি খাটানোর জায়গা করে দিতে জমি কেড়ে বেকার যুবকদের সরকার বোঝাচ্ছে, প্রচুর চাকরী হবে। এটা বিরাট ধাপ্পা। বছর ১৫ আগে হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা করার সময় এই নেতারাই ৬০ হাজার চাকরী হবে বলে কলকাতা থেকে হলদিয়া পর্যন্ত ২৫ হাজার বেকার যুবককে পদযাত্রা করিয়েছিল। সেখানে কতজন কাজ পেয়েছে? আমাদের বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বিধানসভায় বলেছেন, ১১০০ (এগারোশ) জন।

জাতীয় শ্রম সার্ভে-২০০৩ এর রিপোর্ট-এ প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, শিল্পায়নের ঢক্কানিনাদে যে সত্যটি আড়াল করা যাচ্ছে না, তা হল, কম্প্যুটারচালিত নগণ্য সংখ্যক নতুন

শিল্পে যতজনের কাজের সুযোগ হচ্ছে, পুরনো শিল্প বন্ধের ফলে কাজ হারাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী। নীচের সারণি দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, 'শিল্পায়ন'-এর হুল্লোড় বেকারদের ঠকানোর জন্যেই।

সাল	কাজ পেয়েছে	কাজ হারিয়েছে
২০০১	১৬,০২৯ জন	৩ লক্ষ ৭১,০৮৬ জন
২০০৩	৯,১২০ জন	৬ লক্ষ ৩৫,০০০ জন

'উন্নয়ন' মানে শুধু তো বহুতল বাড়ি, আর ফ্লাইওভার বা বিমানবন্দর বা ৮/১০ সারি গাড়ি চলার ঝকঝকে রাস্তা নয়, টাটা বিড়লা আম্বানীদের হাজার গুণ সম্পদ বৃদ্ধিও নয়। প্রকৃত উন্নয়ন মানে, কাজের সুযোগ বৃদ্ধি, বন্ধ কারখানা খোলা, ছাঁটাই শ্রমিকের ও বেকার যুবকদের নিয়োগ বৃদ্ধি। শিল্পপতিরা তো এখন চাইছে, জবলেস (চাকরিহীন) উন্নয়ন—কম্প্যুটারচালিত বেশী পুঁজির অতি নগণ্য সংখ্যক শ্রমিকের কারখানা, ৮ ঘণ্টার বদলে ১২/১৪ ঘণ্টার শ্রমদিবস, বেতন সিকিভাগ, স্থায়ী শ্রমিকের বদলে ক্যাজুয়াল শ্রমিক, ডাউন সাইজিং (শ্রমিক কমানো)। তাই ২/৪ টা নতুন স্বল্প শ্রমিকের কারখানা খুলতেখুলতেই ১৫০/২০০ কারখানা বন্ধ হচ্ছে। কারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেই। তাই বিপুল পুঁজি নিয়োগের সহজ পথ বেছে নেওয়া হয়েছে স্থায়ী শ্রমিকহীন রিয়েল এস্টেট ব্যবসা, নগরায়ণ, আবাসন। এর নাম শিল্পায়ন নয়। শিল্পায়ন হল লাগাতার নতুন কারখানা খুলবে, ব্যাপক মানুষ কাজ পাবে, তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। তবুও ২/৪ টা যা শিল্প কারখানা হচ্ছে সেই শিল্প আমরা চাই, তবে তা অকৃষি-জমিতে হোক। কিন্তু এটাকে শিল্পায়ন বলা অজ্ঞতা, না হয় ধাপ্পা। সারা বিশ্বে বিগত যুগেই শিল্পায়নের যুগ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু চাকরীর লোভ দেখিয়ে ধাপ্পাকে বিশ্বাসযোগ্য করাতে চাইছে নেতারা। এখন তারা যা করতে চাইছে তা উন্নয়নও নয়, শিল্পায়নও নয়। বাস্তবে তা কী?

সিপিএম রাজ্য কমিটির পুস্তিকা ''প্রসঙ্গ — সিঙ্গুর ও শিল্পায়ন'' থেকে কিছু প্রশ্ন।

মন্ত্রীদের নাকি মিথ্যা বলা বারণ, বড়জোর তারা অসত্য বলেন। সিপিএম রাজ্য কমিটির দ্বারা প্রকাশিত ''প্রসঙ্গ — সিঙ্গুর ও শিল্পায়ন'' পুস্তিকায় আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব-এর প্রবন্ধের কয়েকটি লাইন তুলে ধরছি, যাতে মানুষ সত্য বুঝতে পারেন।

মন্ত্রী গৌতম দেব লিখেছেন, ''ডঃ স্বামীনাথনের নেতৃত্বে কৃষি কমিশন বলেছে, পশ্চিম বাংলা সহ পূর্ব ভারতকে খাদ্যশস্য উৎপাদনে পাঞ্জাব হরিয়ানার মতো সামিল করতে হবে, নচেৎ দেশের কপালে দুঃখ আছে। ..... রাজ্যের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা সুবিশাল এবং কর্মসংস্থানের প্রশ্নে কৃষির গুরুত্ব আরো ব্যাপক ও গভীর। ..... গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি দুর্বল হওয়া মানে শহরগুলিতে নাভিঃশ্বাস উঠবে, লাখে লাখে লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে আছড়ে পড়বে।'' (পৃ-৩৩) এই কথার অর্থ তো হচ্ছে, কৃষি বাড়াতে হবে প্রচুর। তাহলে গৌতমবাবুরা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কৃষিকে বলি দিয়ে প্রায় দেড়লক্ষ একর চাষের জমি কেড়ে নিচ্ছেন কেন? এরপরেই ঐ প্রবন্ধে গৌতম দেব সারা বিশ্বের জনসংখ্যা যে শহরমুখী হচ্ছে সে সম্পর্কে তথ্য দিয়ে লিখেছেন, ''আমাদের রাজ্যে এখন মোট আড়াই কোটি শহরবাসী; ২০১১ সালে দাঁড়াবে ৪ কোটি ২০ লক্ষ। শুধুমাত্র বৃহত্তম কলকাতায় এখন যেটা ১ কোটি ৩২ লক্ষ; সেটা দাঁড়াবে ২ কোটি ২৫ লক্ষ। ১ কোটি বাড়বে শুধু কলকাতা সহ আশেপাশে। ব্যাপারটা উপরওয়ালার

হাতে ছেড়ে রাখা হবে, না, আমরা সবাই মিলে কাজে লাগবো? নগরায়ণ কলকাতায় হোক, আর সিঙ্গুর বাজারে হোক, আর চম্পাহাটি বা ঘটকপুকুরে হোক না কেন, জমি লাগবে।'' (পৃ-৩২) মোট কথা নগরায়ণ হবে, জমি লাগবে। তাহলে শিল্প নয়, শিল্পটা বেকার যুবকদের ঠকানোর জন্যে প্রচার। তাই নগরায়ণ বা প্রোমোটারির বেড়ালটা গৌতমবাবুর ঝুলি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ধনকুবেরদের কলকাতাসহ বড় বড় শহরের কাছাকাছি জমি চাই, নাহলে তো বাড়িগুলো বিক্রি হবে না। না দিলে ওরা ক্ষমতায় বসাবে না। কারণ সারা বিশ্বের আজ মারাত্মক বাজার সংকট। এদেশে পুঁজিবাদী শোষণের ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এত কমে গেছে যে, বিপুল পুঁজি খাটিয়ে ভোগ্যপণ্য তৈরী করলে বিক্রি হচ্ছে না। এই বিপুল পুঁজি খাটানোর সহজ রাস্তা হলো বহুতল বাড়ি, রাস্তা, ব্রীজ, শপিংমল, হাসপাতাল বানানো। এতে স্থায়ী শ্রমিক লাগে না, বিরাট লাভ। তাই এই ধনকুবেররা তাদেরই ক্ষমতায় বসাবে, যারা 'সেজ' বানিয়ে তাদের প্রোমোটারির লুঠের ব্যবসা করতে দেবে। জনগণ তো ক্ষমতায় আনে না, জনগণকে মিডিয়ার জৌলুসের বন্যায়, আর টাকা-গুণ্ডা-প্রশাসনের শক্তিতে ভাসিয়ে কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএমকে ক্ষমতায় তো বসায় পুঁজিপতিশ্রেণীই। তাদের স্বার্থ না দেখলে মিডিয়ায় দেবতা বানিয়ে, টাকা, গুণ্ডাশক্তি, আর প্রশাসন দিয়ে জিতিয়ে আনবে না। তাই ব্যাপারটা উপরওয়ালার উপরে ছেড়ে না দিয়ে 'সবাই মিলে কাজে' লেগেছেন তাঁরা। ফলে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি যে যে রাজ্যে সরকারী গদীতে আসীন, তারা প্রভু দেশি-বিদেশি পুঁজিকে তুষ্ট করতে কৃষিজমি দখল করতে বদ্ধপরিকর। এই অবস্থায় যেসব এলাকায় সরকার কৃষিজমি অধিগ্রহণ করতে চলেছে, সর্বত্রই নন্দীগ্রামের পথে প্রতিবাদী সংগ্রাম গড়তে হলে চাই গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন।

গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন

সিঙ্গুরই হোক, আর নন্দীগ্রামই হোক, এই দুটি আন্দোলনই বর্তমান পর্যায়ে সারা ভারতে উদীয়মান কৃষক প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রেরণা। এই দুটি এলাকায় যাঁরা লড়ছেন তাঁরা সাধারণ কৃষক ও তাদের ঘরের মা-বোনেরা, যুবক সন্তানেরা। তাঁরা নামজাদা নেতাও নন, আর ভোটে কে হারবে কে জিতবে তার হিসাব কষতেও লড়ছেন না। প্রাণ যাঁরা দিলেন, যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন, তাঁরা কিন্তু পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যাপী বেপরোয়া দরিদ্র নিধনের পরিকল্পনাকে এইসব ক্ষেত্রে যেকোন মূল্যে প্রতিহত করতেই জীবন বাজী রেখেছেন। কোন দলই দাবী করতে পারে না যে, এই সংগ্রামের কৃতিত্ব তাদের। এ কৃতিত্ব সক্রিয় জনশক্তির। সিপিএম আজ সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে, পুলিশ ও প্রশাসনকে সম্পূর্ণ দলীয় চাকরের মতো ব্যবহার করে গুণ্ডামি দাপট ও মিথ্যাচারের জোরে ত্রাসের যে পরিবেশ তৈরী করেছে, তাকে গণপ্রতিরোধের শক্তি ছাড়া ঠেকানো যাবে না। নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে দলীয় ঐক্য দিয়ে তাকে পরাস্ত করার চিন্তা বাস্তবে আন্দোলনের পথ থেকে সরে যাওয়া। সিঙ্গুরে তৃণমূলের বিধায়ক থাকলেও তারা সরকারকে জমি নেওয়া থেকে প্রতিহত করতে পারেনি, আবার নন্দীগ্রামের বিধায়ক সিপিএম ফ্রন্টভুক্ত হলেও জমি নেওয়ার বিরুদ্ধে জনশক্তিকে ঠেকাতে পারেনি। তাই আজ নন্দীগ্রামের এই মহান সংগ্রামকে সামনে রেখে যারা শুধু নির্বাচনী হিসাবে মত্ত হয়েছেন তাঁরা সংগ্রামেরও ক্ষতি করছেন, আন্দোলনকারীদের মানসিকতারও অসম্মান

করছেন। চাষের জমি ও বাস্তু কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনাটা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের, তা কার্যকর করছে সরকার। তাই সংগ্রামটা তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জনশক্তির, প্রতিরোধের শক্তির। এটা কোন দল বা কোন কোন দলের ফায়দা তোলার হাতিয়ার নয়। গণকমিটি হচ্ছে সক্রিয় জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তি। সেখানে সব দলেরই সমর্থক, এমনকি কোন দল না করা মানুষও অবশ্যই থাকবেন। তাই 'একের বিরুদ্ধে এক' কথাটার যথার্থ তাৎপর্য—সরকার ও পুঁজিপতিদের ঐক্যের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলনের ঐক্য। মনে রাখতে হবে, পরবর্তীকালে যে দলই পুঁজিপতিদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে নির্বাচনী চুক্তির ভিত্তিতে ক্ষমতায় বসুক তাকেও একই পদক্ষেপ নিতে হবে—তখনও এই জনশক্তিই জাগ্রত প্রহরীর মতো তার বিরুদ্ধেও লড়বে।

কিছু বুদ্ধিজীবী ও সংবাদমাধ্যম আন্দোলনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাফল্যের কারণ অনুসন্ধান না করে শুধু নির্বাচনী শক্তি সমাবেশের আন্দোলনবিমুখ সুবিধাবাদী ক্ষমতালোলুপ মানসিকতাকেই ইন্ধন দিচ্ছেন এবং 'একের বিরুদ্ধে এক' এই শ্লোগান তুলে আন্দোলনের অসম্মান ও সর্বনাশ করছেন। আন্দোলনের সার্বিক জয় এখনো আসেনি, অথচ তার বদলে নির্বাচনী ধান্দায় ফাঁসিয়ে দিতে চাইছেন। আক্রমণটা আসছে পুঁজিবাদের স্বার্থে, পুঁজিপতিদের বিপুল অলস পুঁজি খাটানোর শয়তানির জন্য। পুঁজিবাদকে রুখতে তাই একমাত্র বিজ্ঞানভিত্তিক পথ হল মার্কসবাদ। তাই মার্কসবাদকে গাল দিয়ে বা বিরোধিতা করে এই আন্দোলন জয়যুক্ত হবে না। তাছাড়া সিপিএমকে দেখে মার্কসবাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাও ভুল, কারণ ঐ দল মার্কসবাদ বিচ্যুত।

এদেশে বারবার বহু মানুষের আত্মত্যাগ ও রক্তক্ষয়ের বিনিময়ে বড় বড় আন্দোলন সঠিক পরিণতি না পেয়ে নির্বাচনী গণ্ডীর গোলকধাঁধায় ঘুরে মরেছে। ব্যর্থ হয়েছে মানুষের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। এভাবেই যে কংগ্রেসকে একদিন মানুষ চিনেছিল জনবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে, ভেবেছিল সিপিএমকে ভোট দিলেই এর সত্যিকার যোগ্য জবাব হবে, আজ মনে করছেন, ঠকে গিয়েছেন। তাই আজ কোন বিচার না করে ঠিক উল্টো ঘুরে দাঁড়ালে একইভাবে ঠকতে হবে, যদি না সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হয়। তাই আমাদের রাজ্য কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''জনগণকে মনে রাখতে হবে, যতদিন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ টিকে থাকবে ততদিন কৃষিজমি দখল, শিল্প বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই, বেকারীত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা ও অন্যান্য সঙ্কট ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে, জনজীবনে বারবার আক্রমণও নেমে আসবে। তাই একদিকে চাই এই আক্রমণগুলিকে আশু ঠেকাবার জন্য আন্দোলন, অন্যদিকে চাই যত দ্রুত সম্ভব পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করা, যা একমাত্র বৈজ্ঞানিক দর্শন মার্কসবাদকে হাতিয়ার করেই সম্ভব। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের ও পুঁজিবাদী শোষণ কায়েম রাখতে বদ্ধপরিকর ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে এবং সিপিএমের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে মার্কসবাদের বিরুদ্ধতা করলে আজকের দিনের গণআন্দোলনের, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামের অপরিমেয় ক্ষতি হবে। আজ দেশে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি এতটুকু জনমত, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ধার ধারে না, ফ্যাসিবাদী কায়দায় সর্বত্র প্রতিবাদ-আন্দোলনকে দমন করছে। এই অবস্থায় কোন আশু দাবী আদায় করতে হলেও চাই মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল, সংঘবদ্ধ, নৈতিকবলে বলীয়ান লাগাতার আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলিকে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী লক্ষ্য নিয়েই চালনা করতে হবে।''

''জনগণকে মনে রাখতে হবে, অতীতের লড়াইগুলিতে বহু জীবনের কোরবানি সত্ত্বেও অন্ধভাবে নানা রাজনৈতিক দল ও নেতাদের পেছনে ছুটে অনেক ক্ষতি হয়েছে। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ও ভীড় দেখে দেশের মানুষ স্বদেশী আন্দোলনে ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, নেতাজীদের বিপ্লবী ধারার পরিবর্তে দক্ষিণপন্থী আপোষমুখী নেতৃত্বকে গ্রহণ করেছিল, তার সুযোগ নিয়েই বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করেছে। এ রাজ্যেও একইভাবে সিপিএম নেতৃত্ব কংগ্রেসবিরোধী বিক্ষোভকে পুঁজি করে ক্ষমতায় এসেছে। তখন প্রচার করা হত, 'এখন কোন কথা নয়, কংগ্রেসকে হঠানো চাই', 'হঠাতে হলে সিপিএমকে চাই'। আজও আওয়াজ তোলা হচ্ছে, 'সিপিএমকে শিক্ষা দিতে হলে তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপিকে চাই'। দক্ষিণপন্থী দলগুলি এই আন্দোলনে থেকে সংবাদমাধ্যমের ব্যাকিংয়ে সিপিএম-বিরোধী বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ভোটের জমি তৈরী করছে। 'ভোটে একের বিরুদ্ধে এক চাই', এই হাওয়ায় গা ভাসালে আবারও পস্তাতে হবে। জনগণ দেখছেন, এই আন্দোলনে ও অন্যান্য আন্দোলনে এস ইউ সি আইয়ের কর্মীরা বুকের রক্ত ঢেলে লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমে তার খবর প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না। সাংবাদিকরা দুঃখ করে বলেন, 'আমরা জানি, আপনারাই লড়ছেন, কিন্তু আমাদের সংবাদমাধ্যমে এস ইউ সি আইয়ের সংবাদ দেওয়ায় বাধা থাকে।' সংবাদমাধ্যমগুলি সিপিএমের বিকল্প হিসাবে দক্ষিণপন্থীদের দাঁড় করাতে অতি ব্যস্ত, ভয় এস ইউ সি আই সামনে এসে যাবে। কিন্তু এত করেও কি আমাদের দলের অগ্রগতি আটকাতে পারছে? কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই দল সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে জনগণের হৃদয়ে গভীর ভালবাসা ও আস্থায় স্থান করে নিচ্ছে।''

বামপন্থী মানুষ ও সিপিএম ফ্রন্ট সমর্থকদের প্রতি আবেদন

বাস্তবে নন্দীগ্রামেই হোক, আর সিঙ্গুরেই হোক, সারা বাংলার মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক আন্দোলন, এই অভ্যুত্থান শুধু কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে জেহাদ নয়। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসের পুঁজিবাদ-তোষণ নীতির পরিণামে মানুষ দারিদ্রের কষাঘাতে, বেকারী শিক্ষা স্বাস্থ্যের উপর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত। নিঃস্ব, বিপর্যস্ত মানুষ সঠিক বিচার না করে সিপিএম ফ্রন্টকেই তাদের বাঁচার ভরসা মনে করে ক্ষমতায় দেখতে চেয়েছিল। এই রাজ্যে বামপন্থাকে হত্যা করতে দেশের পুঁজিপতিরাও এই ফ্রন্টকে ক্ষমতার মধুতে মজিয়ে কিনে নিতে চেয়েছিল। এই যোগসাজশেই সিপিএম নেতৃত্ব ৩০ বছর আগে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতাসীন হয়। ক্ষমতায় বসার পর তাদের জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ প্রকাশ পেতে থাকে। দুর্নীতি, দলবাজি, দম্ভ-দাপট, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎ-পরিবহণ পঞ্চায়েত কর-সেচ—সর্বক্ষেত্রে জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপে জনমনে জমতে থাকে আগ্নেয়গিরির পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। জমি অধিগ্রহণ সেই ক্ষোভের লাভাস্রোতকে ঠেলে বের করে এনেছে। কিন্তু তাও নেতাদের সম্বিত হয়নি। ৩০ বছর একটানা শাসন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে এই নেতাদের সঙ্গে মুনাফালোলুপ ধনকুবেরশ্রেণীর এমন গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে যে, তাঁরা জনগণের স্বার্থ বা দাবী, সমস্যা বা সংকট বুঝতেও আজ অক্ষম। নেতারা নন্দীগ্রামে সিপিএম সমর্থক সহ ৬০/৭০ হাজার মানুষের ঘরবাড়ি জোতজমি দোকানপাট সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে বাতিল খোসার মতো তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিতে প্রস্তুত। আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড-জার্মান-জাপানির লুঠেরা সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের সঙ্গে বাজার ভাগাভাগির চুক্তিতে আবদ্ধ এ

দেশের ধনকুবের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের যৌথ স্বার্থ রক্ষাই আজ সিপিএম-ফ্রন্টের নেতাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার একমাত্র শর্ত। আর সেজন্য চরম বর্বর অত্যাচার, গণহত্যা, নারীধর্ষণ সহ কৃষক ক্ষেতমজুরদের রক্তে হাত রাঙাতেও তাদের কোন দ্বিধা নেই। এটা তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার বাধ্যবাধকতা। সেইসঙ্গে মিথ্যাচারেরও কোন সীমা পরিসীমা নেই তাদের। অবশ্য এই গুণটি এই পার্টির এমন সহজাত সংস্কৃতি যে কর্মী-সমর্থকরাও আজ নেতাদের কথায় বিশ্বাস করে না, অথচ লোকঠকানোর জন্য প্রচার করে।

কিন্তু তবুও কর্মীদের মনে অন্ততঃ দলের প্রতি আনুগত্যের যে অন্ধতা গড়ে উঠেছিল, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনায় তাদের বিশ্বাসের সেই ভিত ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠেছে। ব্যাপক সংখ্যক, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোন গোষ্ঠীভুক্ত নয়, এমন আপাত অরাজনৈতিক মানুষ তো বটেই, এমনকি সিপিএম কর্মী, সমর্থক, দরদীদের অধিকাংশ হতভম্ব হয়ে গেছেন। বাংলার বামপন্থা কত আন্দোলনের পথে কত শ্রমিক কৃষকের রক্তে তার শক্তি গড়ে তুলেছে, কত প্রাণ আত্মাহুতি গেছে, কত ঘর সংসার তছনছ হয়েছে। তারই ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আবেগ দিয়ে যে কৃষক শ্রমিকরা এতদিন সিপিএমকে জানতো গরীবের পার্টি, লাল ঝাণ্ডার পার্টির আবেগ দিয়ে যে দলের নেতাদের তারা ক্ষমতায় বসিয়েছে, সেই দলের নেতারাই আজ শোষকদের রক্ষা করতে গরীব নিঃস্ব শ্রমিক কৃষককে হিংস্র নিষ্ঠুরতায় বলি দিচ্ছে, হাত রাঙাচ্ছে তাদেরই রক্তে। এই বিভীষিকার মধ্যে দিয়ে চরম বেদনাময় এক সত্য তাঁরা উপলব্ধি করলেন, তা হচ্ছে, তাদের পার্টি বামপন্থা ছেড়ে, মার্কসবাদ পরিত্যাগ করে ক্ষমতার গদীতে টিকে থাকার জন্যেই পুঁজিপতিশ্রেণীর নিকৃষ্ট পাহারাদারে পরিণত হয়েছে। তাই বিজ্ঞানভিত্তিক শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশ মার্কসবাদ অনুযায়ী শোষিতশ্রেণীর আন্দোলনের পাশে সাহস নিয়ে দাঁড়াতে হবে, অন্যথায় দেশি-বিদেশি পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর শোষণ অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন হতে হবে।

সংবাদমাধ্যম (মিডিয়া) কার স্বার্থে, কি চাইছে

প্রথমত মনে রাখা দরকার, সংবাদমাধ্যমগুলি মূলতঃ শোষকশ্রেণীর কুক্ষিগত—অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী -পুঁজিবাদীদের বাজার দখলের ও মুনাফা লুণ্ঠনের মূল স্বার্থকে রক্ষা করার উপযোগী জনমত তৈরী করা তাদের কাজ। এমনকি দেশের মধ্যে গড়ে ওঠা কোন সুস্থ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যদি তাদের স্বার্থরক্ষার বিরোধী হয়, জনগণের মধ্যে বলিষ্ঠতা, তেজ, নৈতিক শক্তির জন্ম দিতে সহায়তা করে, তবে তাকেও তারা কৌশলে ধ্বংস করতে অত্যন্ত স্থূল নিম্নমানের রুচিহীন সংস্কৃতি পরিবেশন করে। এবং এ কাজে ক্ষমতাসীন সব দলই একইভাবে কর্মীদের তৈরী করে, এমনকি নেতারাও সেই অসুস্থ নোংরা লুম্পেন সংস্কৃতি নিয়ে চলে। এভাবেই মিডিয়া যেমন বিদ্যাসাগর, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বকে খাটো করার জন্য কুৎসিত গল্প বানিয়ে দেশের সামনে আদর্শবাদী চরিত্রের প্রভাবকে মুছে দিচ্ছে, তেমনই নাইট ক্লাব, অবাধ মদ্যপান ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতাকে ঢালাও প্রচার দিচ্ছে, লিভ টুগেদার ও সমকামীতাকে উস্কে দিয়ে বিকৃত জীবনের প্রতি যুবসমাজের ঝোঁক বাড়াচ্ছে। এ সবই পচে যাওয়া মুমূর্ষু পুঁজিবাদী অর্থনীতির জীবনকাল দীর্ঘায়িত করার কুৎসিত প্রচেষ্টা। কিন্তু যদি মার্কসবাদের নাম নিয়ে নেতারাও একই ধরণের বিকৃত মনন ও সংস্কৃতি প্রকাশ করেন, সেই লুম্পেন সংস্কৃতি তো মার্কসবাদী নয়, সর্বহারা সংস্কৃতি নয়। মার্কস বলেছেন, সর্বহারা সংস্কৃতি হল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সর্বোচ্চ মননশীলতা;

তা কিন্তু সর্ব-হারা নয়।

এই মিডিয়া সুচতুরভাবে, এমনকি পাঠকবৃদ্ধির জন্য কোন আন্দোলনকে সমর্থন করলেও হুঁশিয়ার থাকে, যেন পুঁজিবাদ ধ্বংসের প্রকৃত শক্তি কোনমতেই প্রচার না পায়। শুধু আদর্শ নিষ্ঠার জোরে, সততা ও সঠিক পদক্ষেপের জোরেই যারা সংগঠন বাড়িয়ে আজ নতুন ধারায় আন্দোলন গড়ে তুলছে তাদের তিলমাত্র সুযোগ দিলে সর্বনাশ হবে এই শোষণমূলক ব্যবস্থার। তাই বামপন্থী মনোভাবের জনগণকে বিভ্রান্ত করতে সংগঠন বা অস্তিত্ব থাকুক না থাকুক, মিডিয়া নির্ভর উগ্র ভাবমূর্তিধারী বিভিন্ন শক্তির প্রচার দিতে বরং তারা প্রস্তুত, কিন্তু ভুলেও এস ইউ সি আই-র নয়। যে শক্তি শুধু আদর্শ নিষ্ঠা ও গণআন্দোলনের শক্তির জোরে বাড়ছে, তাকে শোষক-নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া কোনমতেই সামনে এনে মদত দিতে পারে না। জনগণ ভাবছে, এই সমাজে স্বার্থপরতা আত্মকেন্দ্রিকতা চরম নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি ছেয়ে যাচ্ছে, যুবসমাজ নীতিভ্রষ্ট উচ্ছৃঙ্খল, সব রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই সুবিধা-স্বার্থের পেছনে দৌড়ায়, সেখানে এস ইউ সি আই কর্মীরা লড়ছে কিসের জোরে? তারা সমাজের এই পচন থেকে আত্মরক্ষা করছে কোন্ শক্তিতে? বড় কোনও মহৎ আদর্শ ছাড়া তো এ সম্ভব হতে পারে না! স্বাধীনতা আন্দোলনে যেমন শিক্ষা, চাকরী পায়ে মাড়িয়ে সেরা ছেলেরা দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছে, আজ অন্য সমস্ত দলে বেকার যুবকেরা চাকরী বা সুযোগ সুবিধার জন্যে ছুটলেও এস ইউ সি আই কর্মীরা ঠিক তেমনই চাকরী না নিয়ে বা ছেড়ে দিয়েও অত্যন্ত কষ্টকর সংগ্রাম চালাচ্ছে কি করে? সেই শক্তি দিচ্ছে এ যুগের মহত্তম আদর্শ মার্কসবাদ লেনিনবাদ শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, আর সর্বহারার মহান নেতা কমরেড ঘোষের মার্কসবাদভিত্তিক অতি উচ্চ সংগ্রামী জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই স্তরে স্তরে আমাদের কর্মীদের মধ্যে চরিত্রের মানের পার্থক্য থাকলেও, অনেক অসম্পূর্ণতা থাকলেও এই দলের প্রতি জনগণ আকৃষ্ট হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ নতুন এক সংস্কৃতি, যা মিডিয়ার প্রভাব দিয়ে হয়নি, যা মানুষকে আকৃষ্ট করছে, অন্য দলে যা মানুষ খুঁজে পায় না।

নন্দীগ্রামের মানুষ এত মার খেয়েও লড়ছে কি করে

গত ৩০ বছরে সিপিএম তাদের দলের ও নেতাদের আধিপত্য বিস্তারে সরকারী তহবিল কাজে লাগিয়ে দলীয় গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে খুন-ধর্ষণ সহ নারকীয় অত্যাচার চালানো, পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার করে দলীয় অপরাধীদের মামলা থেকে মুক্ত রাখা ও বিরোধীদের মিথ্যা মামলায় হয়রানি করা প্রভৃতি কায়দায় বাস্তবে এ রাজ্যে অঘোষিত এক আপতকালীন অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে। এই শ্বাসরোধকারী অবস্থায় মানুষ অসহায়ভাবে ভাবত, শত-সহস্র অন্যায় অত্যাচার হলেও কোন প্রতিকার পাওয়া যাবে না। এস ইউ সি আই-এর নেতা-কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা আন্দোলন দেখে মানুষ দূর থেকে সহানুভূতি দেখাত, ভাবত এদের এই স্বপ্ন কবে সফল হবে? আদৌ সফল হবে কি? নন্দীগ্রামের আন্দোলন চাষী মজুর মৎস্যজীবী সহ সর্বস্তরের মানুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বলিষ্ঠতা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ মঞ্চে সমবেত হয়ে যে লড়াই করল, রক্তস্নাত হয়ে, আত্মীয়-স্বজন হারিয়েও বশ্যতা স্বীকার করল না — এই তেজ সারা বাংলার মানুষকে জাগিয়ে দিয়েছে। সিপিএম দলের ব্যাপক কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও এই আন্দোলনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। এই তেজ তারা কোথায় পেল?

নন্দীগ্রামের মানুষের ঐতিহ্য, আপোষহীন সংগ্রামের ঐতিহ্য, স্বাধীনতা সংগ্রামে, তেভাগা আন্দোলনে, উন্নয়ন পর্ষদ-এর আন্দোলনে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এই এলাকার মানুষ বহু মার খেয়েছেন, কষ্টকর বহু সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। সেই ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা মূল ভিত্তি হিসাবে আছে। অন্যায়কে মেনে নেয়নি এই এলাকার মানুষ। পরাধীন ভারতে থানা দখল করতে গিয়ে ১৯৪২ সালে ১৯ জন শহীদ হয়েছেন। এই শক্তিই এবারের সংগ্রামের মূল ভিত্তি। তার উপরে বিশ্বায়নের নামে ধনকুবেরদের লুণ্ঠন-লালসার ও তাদের রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসেবে সিপিএম নেতাদের স্বরূপ যেভাবে চিনেছে নন্দীগ্রামের মানুষ—তাও এই সংগ্রামের শক্তি। এর সাথে নন্দীগ্রামের মানুষের মধ্যে ৩০ বছরের বেশী সময় ধরে দেখা এস ইউ সি আই কর্মীদের নিষ্ঠা, তেজ, সাহস, নিঃস্বার্থপরতার প্রভাব পড়েছে।

প্রায় পৌনে ৩ বছর ধরে আমাদের দলের কর্মীরা একটানা প্রচার ও জনমত গঠনের ফলে নন্দীগ্রামের মানুষ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শুধু নেতাদের উপর নির্ভর না করে বুঝেছে, জনগণের নিজস্ব শক্তিতেই প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। উচ্চ সংস্কৃতি ও নৈতিকতার আধারে গণকমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের যে শিক্ষা এদেশের গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষ তুলে ধরেছেন, তাকে নন্দীগ্রামে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু যতটুকু ধারণা মানুষ পেয়েছে তার পরিচয় লাগাতার ৪ মাস রাষ্ট্রীয় ও দলীয় হিংস্র সন্ত্রাস প্রতিরোধে জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্যে পাওয়া গেছে। এই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন ব্যাপক সাধারণ কৃষক ও বিশেষ করে তাদের ঘরের মহিলা ও যুবক সন্তানেরা। তারা বেশীরভাগই কোন বিশেষ দলের নয়। নন্দীগ্রামের মানুষ, বিশেষতঃ মায়েরা বোনেরা আজ সারা দেশের যেখানেই যত সংগ্রাম হচ্ছে বা হবে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ লড়বে, তাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। নন্দীগ্রামের শহীদেরা আজ সারা দেশের প্রণম্য প্রেরণা, তার মায়েরা বোনেরা অবিস্মরণীয় গৌরবের দৃষ্টান্ত। দেশের কোনায় কোনায় নিপীড়িত মানুষের মনে 'সেজ' নিয়ে হোক অথবা যেকোন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে হোক, সেখানেই প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা জাগলে, এই মহান ঐতিহাসিক আন্দোলনের অনুসরণ করবে তারা—এটাই শাসক দলগুলির ও দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর আতঙ্কের কারণ। এই আন্দোলন চিনিয়ে দিয়েছে পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণকে রক্ষা করতে শাসকদল সহ রাষ্ট্রশক্তির হিংস্র ও ফ্যাসিবাদী রূপ, ন্যায়নীতি, নিরপেক্ষতা, বিচারবোধকে কিভাবে গণতন্ত্রের বুকনির আড়ালে পদদলিত করা হয়।

নন্দীগ্রামের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'র নেতৃত্বে এখনো বহুদিন সংগ্রাম করে যেতে হবে। আমাদের দল এই সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়ে থাকবে। ২০০০ আহত মানুষকে ও নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিতে আমরা জনগণের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করছি। সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, এ ব্যাপারে মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন। দু দফায় গণহত্যার পরেও আবার সিপিএম নেতৃত্ব আক্রমণের ও গণহত্যার ছক কষছে — এই বর্বরতার বিরুদ্ধে সর্বত্র সোচ্চার হোন।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক কালে বাস্তু ও কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনের শহীদগণ

সিঙ্গুর

রাজকুমার ভুল
তাপসী মালিক

নন্দীগ্রাম

ভরত মণ্ডল	**উত্তম পাল (শম্ভু)**
বিশ্বজিৎ মাইতি	**সেখ ইমদাদুল (রাজা)**
সেখ সেলিম	**বাসন্তী কর**
ইমাদুল খাঁন	**বাদল মণ্ডল**
সুপ্রিয়া জানা	**পঞ্চানন দাস**
গোবিন্দ দাস	**রাখাল গিরি**
রতন দাস	**প্রলয় গিরি**
জয়দেব দাস	**পুষ্পেন্দু মণ্ডল (বাঘা)**

যারা নিখোঁজ

সুব্রত সামন্ত

(একে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যেতে দেখা গেলেও এর দেহ পাওয়া যায় নি,)

দুর্গাপদ মাইতি

(এছাড়া নিখোঁজ আরও অনেক নাম এসেছে, তাদের সম্পর্কে এখনও সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নি।)